দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

সেনা অভ্যুত্থান নয়
টোলপ্লাজায় সৈনিকরা
রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার
কাজই করছিলেন
পৃঃ - ১২

পশ্চিমবঙ্গে
শিশুবাজার
প্রশাসনিক ব্যর্থতার
ফল
পৃঃ - ১৪

৬৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬।। ৩ পৌষ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

পশ্চিমবঙ্গে শিশু-বাজার

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ৩ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৯ ডিসেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

কালোবাজারমুক্ত দেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর এছাড়া কোনো পথ খোলা ছিল না □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : জলে ফেলেছেন মোদী, সাঁতারটা শিখেই নিন □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

সেনা অভ্যুত্থান নয়, টোলপ্লাজায় সৈনিকরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কাজই করছিলেন □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) □ ১২

পশ্চিমবঙ্গে শিশুবাজার প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৪

মানব সভ্যতার অবক্ষয় : পণ্য হয়ে যাচ্ছে মানবশিশু □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৭

মরিশাস : ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ □ লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা □ ২১

তথাকথিত উদারবাদীদের অবরুদ্ধ মন □ অমৃত ধীলন □ ২৭

দিদির যে সব দিতে হবে □ অভিমন্যু গুহ □ ২৯

তিন তালাক প্রথার অবসান চায় আরশিয়া □ মাধবী মুখার্জী □ ৩১

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি : পরিবর্তনের দিশারি □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত

দেশের সিনেমা হলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে এবং সেইসময় দর্শকদের উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই প্রসঙ্গে এবারে লিখেছেন কাঞ্চন গুপ্ত ও ধর্মানন্দ দেব। এছাড়া নোট বাতিলের বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাস রোধ ও কালোটাকা উদ্ধারে নোট বাতিলের প্রভাব

গত ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণার পর সরকার পক্ষকে অনেকেই চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। নিজেদের মতো করিয়া নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করিতে তাহারা ব্যস্ত। কাহারও বক্তব্য, আগেভাগেই পরিকল্পনা করিয়া এই ঘোষণা করা উচিত ছিল। কেহ বা মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে রাস্তায় নামিয়াছেন। কালোটাকা সংগ্রহে ও ব্যয়ে সিদ্ধহস্ত মায়াবতী, মুলায়মরা কংগ্রেস ও তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়িয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশনটাই প্রায় বানচাল করিয়া দিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশি সোচ্চার হইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার দল তৃণমূল। নোট বাতিলের ঘোষণা কেন্দ্র সরকারকে প্রত্যাহার করিতে হইবে—এই মর্মে দাবি জানাইয়া রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাবও গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিং সরকারের সদিচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়াও নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নাই।

ঘটনা হইল দেশের অধিকাংশ মানুষ এই ঘোষণাকে জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন। ব্যাঙ্ক ও এটিএমে লাইনে দাঁড়াইবার কষ্ট, হাতে খুচরো নোট না থাকিবার অসুবিধা ইত্যাদি সহ্য করিতেছেন। ব্যাঙ্ক-কর্মীদের ৯৫ শতাংশই হাসিমুখে ওভারটাইম করিতেছেন। নোট-বাতিল লইয়া দেশের কোথাও জনরোষের বিস্ফোরণ হইয়াছে এমন কোনো সংবাদ নাই।

নোট বাতিল ঘোষণার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সিদ্ধান্তের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়াছিলেন। একটি সীমান্তের ওপারে থাকা শত্রুদের মোকাবিলা করা, বিশেষত যাহারা জালনোট ব্যবহার করিতেছে। দ্বিতীয়টি হইল দুর্নীতি ও কালোটাকার কোমর ভাঙিয়া দেওয়া। সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক বিভেদমুক্ত ভারত গড়িবার লক্ষ্যে জালনোট ও কালোটাকা যে সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি তাহা নূতন করিয়া বলিবার নয়। আর এই কারণেই আগাম সংকেত ছাড়াই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করিতে হইয়াছে। এইরকম এক বড় পরিবর্তনের দিকে আগাইতে হইলে যে কিছু অসুবিধা বা ঝামেলা পোহাইতেই হয়, সরকারের বিপক্ষ কিছু দল ও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতেছেন। জিডিপি বাড়িবে না কমিবে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। অথচ দুর্নীতি দমন এবং সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গটি এড়াইয়া যাইতেছেন।

কালোটাকার সন্ধানে ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (আই ডি) বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। আয়কর বিভাগের হানায় মধ্যপ্রদেশে ৪৪টি ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ১০০ কোটি টাকা জমা পড়িবার ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। কর্ণাটকে হাওলা ডিলারের বাড়ির বাথরুম হইতে ৬ কোটির নূতন নোট উদ্ধার হইয়াছে। আহমেদাবাদে ১৪ হাজার কোটি কালোটাকা-সহ টিভি স্টুডিওর মালিক মহেশ শাহকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অর্থাৎ নেতা-আমলা তথা ব্যবসায়ীদের অঘোষিত কোটি কোটি লুকানো টাকার হদিশ পাওয়া যাইতেছে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে কালোটাকার কারবারিদের কোমর যে ভাঙা হইতেছে তাহা স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, সরকারের এই অর্থনৈতিক সার্জিকাল স্ট্রাইক সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলিয়াছে। টোরোরিস্ট ফান্ডিং, হাওলায় ক্যাশ ট্রান্সফার, সীমান্তের ওপার হইতে নকল নোটের কারবার, মাওবাদী গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। কাশ্মীর উপত্যকায় সেনা-জওয়ানদের লক্ষ্য করিয়া পাথর বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। তাই দুর্নীতি রোধে এবং সন্ত্রাসবাদ ঠেকাইতে নোট-বাতিলের সিদ্ধান্ত যে যথোচিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে বাধা কোথায়?

সুভাষিতম্

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরাও তা অনুসরণ করেন। তিনি যা কিছু প্রমাণ করেন, সকল মানুষ তা অনুসরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের নাকের ডগায় রমরমিয়ে চলছে গাঁজার চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিলো প্রতি লাভ গড়ে ৮ হাজার টাকা। সেই তুলনায় খরচ নামমাত্র, ক্ষতির সম্ভাবনাও কম। তাই ভারত- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রমরমিয়ে গাঁজার চাষ হচ্ছে। এই কারবারের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসাদারেরা। খবরে প্রকাশ, ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিঘার পর বিঘা জমি লিজ নিয়ে চলছে গাঁজার চাষ। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া নকশালবাড়ি এবং ইন্দো-ভুটান সীমান্তে জয়গাঁওতেও ছড়িয়ে পড়েছে এই ব্যবসা। কয়েকশো বেকার যুবক এবং নাবালক এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের কারবারিরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আগাম মোটা টাকা দিয়ে জমি লিজ নিচ্ছে। চাষের পদ্ধতি, বীজ সার কীটনাশক ইত্যাদিও মধ্যপ্রাচ্যের। যাতে কোনো বাধা না আসে তার জন্য তৈরি করা হয়েছে মাস্তান বাহিনী। ক্লাব ও রাজনৈতিক দলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত মাসোহারা। অভিযোগ, শাসক তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের অনেকেই এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত গাঁজার বাজার দর ৮-৯ হাজার টাকা প্রতি কেজি। ওই গাঁজাই বাংলাদেশে কিলো প্রতি ১২-১৪ হাজার টাকায়, দিল্লিতে ১৮-২০ হাজার টাকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ৩৪-৩৮ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে যোগসাজশে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে গাঁজা চাষ বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রশাসন।

রাজ্য পুলিশের এডিজি নটরাজন রমেশবাবু বলেন, 'আমরা বিষয়টির খোঁজ নিচ্ছি। অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেব।' জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার বরুণ রায় বলেন, 'সত্যিই বিষয়টি উদ্বেগের। পুলিশ কাজ করছে না তা নন তবে কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে।' কিন্তু বরুণবাবু যাই বলুন, স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পুলিশ সব জানে। পুলিশের মদতেই চলছে এই অবৈধ ব্যবসা।

দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৯০০, ভোটে লড়ে না ৪০০টি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজনীতি ভারতীয়দের রক্তে! তার প্রমাণ দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৯০০। কিন্তু এর মধ্যে ৪০০টি দল কখনও কোনো নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সম্প্রতি এই বিস্ফোরক তথ্যটি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিম জাইদি। তাঁর আশঙ্কা, রাজনৈতিক দল হয়েও নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা কালোটাকা সাদা করার অন্যতম পন্থা হতে পারে। নির্বাচন কমিশন তাদের তালিকা থেকে এই ধরনের ভোটবিমুখ রাজনৈতিক দলের নাম বাতিল করার কাজ শুরু করেছে। নাসিম জাইদি বলেন, 'তালিকা থেকে নাম একবার বাদ পড়লে এইসব রাজনৈতিক দল চাঁদা এবং অনুদান বাবদ যে অর্থ সংগ্রহ করে তার ওপর কোনো আয়কর ছাড় পাবে না।' কিন্তু নির্বাচন কমিশন এদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করছে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে আমাদের তাই করতে হবে। বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ায় আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা আপাতত নাম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে নথিভুক্ত মোট রাজনৈতিক দল এবং কখনও ভোটে না লড়া দলগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। দিতে হবে প্রতিটি দলের চাঁদা বা অনুদান সম্পর্কিত তথ্যও। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, দেশে বহু রাজনৈতিক দল আছে যারা ভোট আদায় করার জন্য ঘুষ দেয়। কখনও সাধারণ মানুষকে কখনও আবার সংবাদ মাধ্যমকে। মিডিয়াকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হয় কোনো বিশেষ দলের সুবিধার্থে মিথ্যে বা বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশনের জন্য। এইসব অসাংবিধানিক এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম যাতে অবিলম্বে বন্ধ করা যায় তার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে যথার্থ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। এমনকী প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্সও জারি করতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের এনজিও লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'Laweyers Collective' নামে উকিলদের বকলমে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালাতেন ইউপিএ আমলে উচ্চ সরকারি পদে থাকা ইন্দিরা জয় সিং। এই সংস্থাটির কর্ণধার ছিলেন তিনি। বিদেশ থেকে আসত বিপুল অনুদান। সরকারি দপ্তরের তরফে অনুসন্ধানে উঠে আসে বিদেশি অনুদানের ব্যবহারে সংস্থার হিসেবে নানান অসংগতি। সংস্থার তরফে দাখিল করা রিটার্নের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত করা হয়।

পূর্বতন ইউপিএ সরকারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল থাকা ইন্দিরা জয়সিং-য়ের সংস্থার অনুমোদন বাতিল করার কারণ হিসেবে বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA)

ভঙ্গ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। সংস্থা ২০০৬-০৭ ও ২০১৩-২০১৪ সালে বেআইনিভাবে বিদেশি অনুদান তাদের খাতায় জমা করেছে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অভিযোগ।

সরকারের তরফে অনুমোদন বাতিল করা আদেশটিতে বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘন করা ছাড়াও জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার মতো গুরুতর প্রমাণ রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসেই এই সংস্থাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিটিং, মিছিল, ধরনা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যেগুলি পরিচালনার খরচ বিদেশি অনুদানকে অবৈধভাবে ব্যবহার করেই চালানো হোত। কেন্দ্রীয় সরকার দেশবিরোধী কাজের জন্য যে ২৫টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই সংস্থাটি তার মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে গৃহমন্ত্রকের তরফে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে কী করে একজন প্রবীণ উচ্চ সরকারি পদাধিকারী এতদিন ধরে বিদেশ থেকে অকাতরে অর্থ গ্রহণ করে চলেছেন। দেশের কোনো সরকারি পদাধিকারীকে কীভাবে বিদেশি বেসরকারি সংস্থার Pay Roll-এ দেশের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ অঘোষিত কাজকর্মের পরিচালনার জন্য যে নথিভুক্ত ছিলেন সে বিষয়টিও তাঁরা খতিয়ে দেখছে। ভারত সরকার নিযুক্ত কোনো আইনি উচ্চ আধিকারিকের পক্ষে এটি সম্পূর্ণ অবৈধ বলে দপ্তরের অভিমত। গৃহমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই সংস্থার পক্ষেই সরকারি পদে থেকেও আর এক কালো তালিকাভুক্ত সংস্থা তিস্তা শিতলাবাদের 'সবরং ট্রাস্ট'কে বিদেশি মুদ্রা আইন ভঙ্গ করার মামলায় আইনি সাহায্য দেওয়া হোত। শুধু তাই নয়, এই সংস্থাই কুখ্যাত জঙ্গি ফাঁসির আসামি ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে মধ্যরাতে তার ফাঁসি রোধের আবেদন নিয়ে গোলমাল পাকাবার মতো ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজ করেছিল। চোরে চোরে যে মাসতুতো ভাই তা এঁরা প্রমাণ করে ছাড়বেনই।

সরকারের হুঁশিয়ারির পর জনধন খাতাগুলিতে কালোটাকা ঢোকায় ভাটা পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীর্ঘদিন ধরে অসাধুতায় মদত দেওয়া দেশে প্রধানমন্ত্রীর আচমকা বিমুদ্রাকরণের ঘোষণা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাৎক্ষণিক বড় ধাক্কা দেয়। বেহিসেবি টাকার মজুতদাররা ভয়ঙ্কর ফাঁপড়ে পড়ে নানা সলুকসন্ধান শুরু করে গরিবের জনধন খাতায় রাতারাতি তাদের টাকা সরাবার সব রকম প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই তৎপরতা নজরে আসতেই সরকার ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে ওই অ্যাকাউন্টগুলির ওপর বাড়তি নজরদারির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সে দাওয়াই যে কালোধনওয়ালাদের কুকর্মকে অনেকটাই আটকে দিয়েছে তা প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার।

বিমুদ্রাকরণের পর ৮ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর প্রথম সপ্তাহে খাতাগুলিতে কুড়ি হাজার দু'শো ছয় কোটি টাকা জমা পড়ে। দ্বিতীয় সপ্তাহ (১৬.১১ থেকে ২২.১১ নভেম্বরে) এই জমা এক ধাক্কায় ১১৩৪৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। ২৩.১১— ৩০.১১ তারিখের শেষ সপ্তাহে তা আরও কমে ৪৮৬৭ কোটিতে দাঁড়ায়। কালোটাকা পাচারকারীদের যে এতাবৎ কোনো ভয়ডর ছিল না তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ সরকারের নজরদারি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হওয়ায় ধান্দাবাজরা প্রায় জালে আটকে যায়। ডিসেম্বরের ১ ও ২ তারিখে মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী এই বেনামি জমা কমতে কমতে যথাক্রমে ৪১০ ও ৩৮৯ কোটি টাকায় এসে দাঁড়ায়। আয়কর দপ্তর অবশ্য ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলকে চিহ্নিত করে যে ব্যাঙ্কগুলির জনধন খাতায় নজরে পড়ার মতো বেশি টাকা জমা পড়েছে তার ওপর তদন্ত করার তোড়জোড় করছে। জনধন কাণ্ডটি দেখে মনে হয় দেশের বিগড়ে যাওয়া প্রবঞ্চক ধনীদের এখন লাঠ্যৌষধিরই প্রয়োজন।

রাজ্যের পরামর্শ মেনে কেন্দ্রের নয়া ক্রীড়ানীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রিও অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স ভালো হলেও পদকসংখ্যা বাড়েনি। শাটলার পি ভি সিন্ধু রুপো জিতেছেন এবং কুস্তিগির সাক্ষী মালিক ব্রোঞ্জ। জিমন্যাস্ট দীপা

পি ভি সিন্ধু

সাক্ষী মালিক

কর্মকারকে চতুর্থ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এই ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বেশি সংখ্যায় নতুন প্রতিভা অন্বেষণ, প্রশিক্ষণ এবং স্পোর্টিং হাবগুলির বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে নতুন ক্রীড়ানীতি গ্রহণ করল।

সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের সচিবের সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্থির হয়েছে প্রত্যেক রাজ্য থেকে ৫০টি সেরা প্রতিভা বাছাই করে তাদের সব ধরনের সুযোগসুবিধে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে পারফরম্যান্স আরও ভালো করা। বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে রাজ্যে যে খেলার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে, এখন থেকে সেই রাজ্য সেই খেলায় নবীন প্রতিভা অন্বেষণে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। অর্থাৎ সাইনা নেহওয়াল, পি. ভি. সিন্ধু বা সানিয়া মির্জার নিজের রাজ্য তেলেঙ্গানা। সুতরাং রাজ্যটি ব্যাডমিন্টন এবং টেনিসের নবীন প্রতিভা অন্বেষণে জোর দেবে। দীপা কর্মকারের মতো প্রতিভার জন্ম ত্রিপুরায়। সেখানে জিমনাস্টিক্সের উপযোগী পরিকাঠামো যেমন আছে, ঠিক তেমনই রয়েছেন বিশ্বেশ্বর নন্দীর মতো প্রশিক্ষক।

বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রীদের কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রীড়া রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল অনেকদিন ধরেই ক্রীড়াকে কেন্দ্র-রাজ্য যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সওয়াল করে আসছেন। এদিনের বৈঠকে এই প্রসঙ্গটিও ওঠে। বৈঠকের মিনিট বইয়ের বিবরণ : 'ক্রীড়াকে যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সেই বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়'। পরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল বলেন, 'ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের ভিন্নমুখী নীতির কারণে খেলাধুলোয় প্রত্যাশিত ফল মেলে না। একমাত্র ক্রীড়াকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

উষ্ণায়নে ৯০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জলভূমি নিশ্চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ৯০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জলভূমি, যা ইউরোপে যত হ্রদ আছে তার সমান, গত ৩২ বছরে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইউরোপীয় কমিশনের জয়েন্ট রিসার্চ সেন্টার এবং গুগলের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য। নাসা এবং ইউএস জিএস-এর ল্যান্ডসেট স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম থেকে পাওয়া প্রায় ১.৮ পিটাবাইট তথ্য ও ছবি বিশ্লেষণ করে গবেষণাকারী দুই সংস্থা জানিয়েছে, সবচেয়ে ভয়াবহ জলভূমি নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে উজবেকিস্তান এবং কাজাখাস্তানে। সেখানে গত ৩২ বছর ধরে একটু একটু করে একটা আস্ত সমুদ্র (আরাল সি) হারিয়ে গেছে। ইরান এবং আফগানিস্তানেও অর্ধেক জলভূমি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। ইরাকে এক-তৃতীয়াংশ জলভূমি নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে, মিসিসিপি বদ্বীপ ক্রমশ মেক্সিকো উপসাগরে তলিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিসিসিপি ব-দ্বীপের আয়তন লন্ডনের দশগুণ।

আই-এস যোগ সন্দেহে ইঞ্জিনিয়ার ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে রণবিজয় সিং নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি দুর্নীতিদমন শাখার পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, রণবিজয় ইসলামিক স্টেটের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। জানা গেছে, রণবিজয় রাজস্থানের জে আর এন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটেক পাশ করেছে। কাতার ও ওমানে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিও করেছে। ২০১৫ সাল থেকে সে শিলিগুড়ির প্রধাননগরে বসবাস করছে। ধৃতের কাছ থেকে ৫টি জিএসএম মেশিন, ৪টি ল্যাপটপ, ১৫৫টি নেপালের সিমকার্ড, ৩৫টি ভারতীয় সিমকার্ড একই নামে তিনটি পৃথক আই ডি নম্বরযুক্ত ভোটারকার্ড, ৬টি এটিএম কার্ড, এটিএম সোয়াইপ মেশিন, প্রচুর পেনড্রাইভ ও কার্ড রিডার পাওয়া গেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশের ধারণা রণবিজয় ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া এটিএম সোয়াইপ মেশিন থাকায় ধারণা করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের এটিএমের নম্বর ও পিনকোড জেনে নিয়ে সে জালিয়াতি চক্রের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে।

পাকিস্তানকে রাজনাথের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং কঠোর ভাষায় পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি মতিগতি না বদলায় তাহলে তাদের আরও নির্মম ফলভোগের জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান জানে সরাসরি যুদ্ধ হলে তারা ভারতের কাছে ল্যাজেগোবরে হবে, তাই পিছন থেকে ভারত-বিরোধী কাজকর্মে মদত দিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাঙার যে নোংরা খেলা পাকিস্তান খেলছে তাতে তারা কোনোদিনই সফল হবে না।

ভারতের সাহসী সৈন্যরা চারবার তাদের পর্যুদস্ত করেছে, প্রয়োজন হলে আবার করবে। তাঁর উপদেশ, পাকিস্তানের উচিত সন্ত্রাসবাদকে এবার মানে মানে বিদায় করা এবং কয়েকটা ছিঁচকে জঙ্গি পাঠিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতভূখণ্ড থেকে আলাদা করার দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করা। পাকিস্তানের বোঝা উচিত সন্ত্রাসবাদ কাপুরুষের ধর্ম বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উবাচ

“এস পি ত্যাগীর গ্রেপ্তার একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এতে বায়ুসেনার ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়দের মতো আমাদেরও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। তাই আশা করা যায়, আইনি প্রক্রিয়ায় যাই উঠে আসুক বা তদন্তের ফলাফল যাইহোক সকলের কাছেই তা গ্রহণযোগ্য হবে।”

অরূপ রাহা
বায়ুসেনা প্রধান

অগুস্তা-কাণ্ডে প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এস. পি. ত্যাগীর যোগ ও তার গ্রেপ্তার হওয়া প্রসঙ্গে।

“এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ফারুক, ওমর আবদুল্লার মতো ঝানু রাজনীতিকরা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করবেন।”

বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত কনফারেন্সকে সমর্থন প্রসঙ্গে।

রামমাধব
সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

“পাকিস্তান আবার ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করতে চাইছে। তারা যদি সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য বন্ধ না করে তবে নিজেরাই দশ টুকরো হয়ে যাবে।”

রাজনাথ সিং
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কাঠুয়াতে সেনাদের উদ্দেশে স্মৃতি-তর্পণের এক অনুষ্ঠানে।

“ওটা খুবই সংক্ষিপ্ত একটা কল ছিল। আপনার জয়ের জন্য অভিনন্দন বলে। অন্য কোনো দেশ কেন এসে বলবে যে, আমি কারো ফোন ধরতে পারব না।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথা নিয়ে চীনের আপত্তি প্রসঙ্গে।

কালোবাজারমুক্ত দেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর এছাড়া কোনো পথ ছিল না

গূঢ় পুরুষের কলম

হাসমুখ আধিয়া। আমাদের দেশের কতজন মানুষ এই নামটির সঙ্গে পরিচিত তা আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। কারণ, গুজরাট ও দিল্লির সরকারি মহলের বাইরে তাঁর বিশেষ পরিচিতি নেই। হাসমুখ গুজরাত ক্যাডারের একজন আই এ এস অফিসার। নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী তখন হাসমুখ আধিয়া ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সচিব। শুধু এইটুকু বললে কম বলা হবে। মোদীজী হাসমুখের সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন না। গুজরাটের দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন মোদীজীর ছায়া সঙ্গী। মোদীজীকে সেই সময় মানসিক চাপমুক্ত থাকতে তাঁকে প্রতিদিন সকালে যোগ সাধনার পরামর্শ দিয়েছিলেন হাসমুখ আধিয়া। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর কালোটাকা উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করতে তখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে তিনি দায়িত্ব দেন। তাছাড়া আর্থিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চান মোদী। কিন্তু সকলেই তাঁকে হতাশ করেন। এদিকে কালোটাকা উদ্ধারে মোদীজীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিরোধী নেতাদের বিদ্রূপ দেশজুড়ে ঝড় তুলেছে। এইরকম একটা টালমাটাল পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়ে হাসমুখ আধিয়াকে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানান কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিবের পদে দায়িত্ব নিতে। হাসমুখ কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিবের পদে যোগ দেন ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

এই দীর্ঘ ভূমিকার কারণ, গত ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের যুগান্তকারী ঘোষণার নেপথ্য কারিগর হচ্ছেন এই হাসমুখ আধিয়া। তাঁরই পরামর্শ মেনে প্রধানমন্ত্রী পাঁচশো ও হাজারের নোট বাতিলের ঘোষণা করেন। ঘোষণা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। হাসমুখ রাজস্ব সচিবের পদে যোগ দেওয়ার পরেই প্রধানমন্ত্রী তাঁকে তাঁর ৭ নম্বর রেসকোর্স রোড বাসভবনে ডেকে পাঠান। সেখানে তিনি তাঁকে দায়িত্ব দেন দেশের কালোটাকার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে দেশরক্ষার। এই যুদ্ধে তিনি মোদীজীর প্রধান সেনাপতি। গুজরাটের এই দুঁদে আমলা প্রথমেই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন এই যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে চরম গোপনীয়তাই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁর রাজস্ব দপ্তর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির অধীন। কিন্তু অর্থমন্ত্রীকেও এই বিষয়ে আগাম জানানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দেন। এরপরেই কাজে নেমে পড়েন হাসমুখ। গুজরাট থেকে তিনি তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ পাঁচজন আমলাকে দিল্লি নিয়ে আসেন। এই পাঁচজনের কাজ নিরন্তর গবেষণা করার। দিল্লির সরকারি মহলে তাঁদের পরিচয় প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দুটি ঘর তাঁদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সেটাই অফিস। সেটাই বাসস্থান। এই পঞ্চ-আমলার গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল দেশে কত নোট চালু আছে। জানা যায় ১৫.৪ লক্ষ কোটি টাকা তার ৮৪ শতাংশ পাঁচশো এবং হাজারের নোট। দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কত বা এটিএম ব্যবস্থাটা কেমন। দেশে চালু নোটের ৮৪ শতাংশ বাতিল হলে জন-প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। অথবা বাতিল নোটের শূন্যস্থান নয়া নোটে পূরণ করতে কতটা সময় লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর ৭নং রেসকোর্স রোডের বাসভবনে নোট বাতিলের এই গবেষণা চলেছিল টানা এক বছর। এই দীর্ঘ সময়ে প্রতি রাত্রে গবেষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গোপন বৈঠক হয়েছে। গবেষকদের নেতা হিসেবে হাসমুখ আধিয়া জানিয়ে দেন নোট বাতিলের প্রাথমিক ধাক্কাটা চলবে কমপক্ষে পঞ্চাশ দিন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে তিন মাস। রবি শস্য কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু নতুন আর্থিক বছরে দেশ কালোটাকা মুক্ত হয়ে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোবে। অর্থাৎ কালোবাজার মুক্ত দেশ গড়তে গেলে বিপদ ও ঝুঁকি নিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকি নিয়েছেন। এছাড়া অন্য দ্বিতীয় পথ ছিল না। হাসমুখের পরামর্শ ছিল প্রধানমন্ত্রী ১৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণা করুন। কিন্তু ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় দেখা যায় দিল্লির সোনা ও হিরের গয়নার দোকানে কালোবাজারিরা লাইন দিয়েছে। বোঝা যায় নোট বাতিলের গোপন সিদ্ধান্ত আর গোপন নেই। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী। এই বৈঠকে মোদীজী স্পষ্টভাবে বলেন, 'নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যদি ব্যর্থ হয় তবে তার জন্য আমি একাই দায়ী থাকবো। দেশের কালোটাকা নিয়ন্ত্রণে এটাই সঠিক পথ।' অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনো গবেষক লেখক ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস তোলপাড় করা এই ঘটনা নিয়ে বই লেখেন তখন হাসমুখ আধিয়া এবং তাঁর পঞ্চ-গবেষকের সঠিক ভূমিকাটা কী ছিল জানা যাবে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে ঠিক কী পরামর্শ দিয়েছিলেন। কীভাবে ৮ নভেম্বর খবরটা ফাঁস হয়। সেদিন সন্ধ্যায় মাত্র চার ঘণ্টায় দিল্লিতে 'কুন্দন জুয়েলার্স' একাই ১০০ কোটি টাকার গয়না বিক্রি করে। ■

জলে ফেলেছেন মোদী, সাঁতারটা শিখেই নিন

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

দেশ এক বিপ্লবের মুখে। এমন পরিবর্তন আগে হয়নি। বামেদের সরিয়ে দিদির ক্ষমতায়নও এই বদলের কাছে নগণ্য। আসুন আমরা সকলে এই বিপ্লবে অংশ নিই। দেশ এগোবেই। শপথ নিয়েছেন মোদী। আর ১৩০ কোটি মানুষ যদি এক পা করে এগোন তবে দেশ এগিয়ে যাবে ১৩০ কোটি পা। এটা মানতেই হবে যে, একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাতারাতি বাতিল করে দিয়েছেন ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। সেটি যে তাঁর পরিকল্পিত বৃহত্তম সংস্কারেরই ছোট্ট ধাপ মাত্র, সেই আভাসও তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে বারে বারে দিয়ে গিয়েছেন। মোদী দেশকে 'ক্যাশলেস' সমাজে পরিণত করতে চাইছেন। যে-সমাজে সমস্ত লেনদেন হবে আন্তর্জাল ব্যবস্থা মারফত। কারও কোনো দুর্নীতি করার সুযোগ থাকবে না। কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না। কোনো তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ, কোনো চুরি, ছিনতাই থাকবে না। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভারত হবে বিশ্বের স্বচ্ছতম দেশ।

এ ব্যবস্থা আসলে মোদীর 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'রই 'এক্সটেনশন'। জিনিসপত্র কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগদ টাকার ব্যবহার যাতে কমানো যায় এবং একটা সময়ের পরে নগদ টাকার ব্যবহার যাতে একেবারেই না হয়, সেই পরিকল্পনাই মোদী করেছেন। তাঁর এই নয়া পরিকল্পনার নাম তিনি দিয়েছেন 'ডিজিটাল ইকনমি', 'ক্যাশলেশ ইকনমি'। মোদী ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের উপরও জোর দিয়েছেন। দেশের মানুষকে অনুরোধ করেছেন, দ্রুত এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। যে সমস্যা ৭০ বছর ধরে দেশকে কুরে কুরে খেয়েছে, তার সমাধান ম্যাজিকের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। ফলে, কষ্ট হবেই। হচ্ছেও। কিন্তু দেশবাসী যে সেই কষ্ট সহ্য করে নিচ্ছেন, সেই মর্মে দেশবাসীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মোদী। এবং তিনি সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছেন দেশের তরুণ প্রজন্মের উপর। তিনি মনে করছেন, টেকস্যাভি, নেটস্যাভি তরুণ প্রজন্মই পারবে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা জরুরি। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন বলেই দেশ রাতারাতি 'ডিজিটাল' হয়ে যাবে, এ স্বপ্ন ভারতের মতো দেশে অলীকই! তবে সেই অলীককে বাস্তব করা যাবে যদি আমরা সবাই এগিয়ে আসি।

মনে রাখতে হবে ডিজিটাইজেশন আধুনিকতার অন্যতম মানদণ্ড। ক্ষমতায় এসেই 'ডিজিটাল' ইন্ডিয়া'র স্লোগান তুলেছিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। স্লোগানকে বাস্তবের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন অরুণ জেটলি। ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা ঘোষণা করছেন। বাকি দায়িত্বটা দেশবাসীর। আসুন আমরা এগিয়ে যাই। বেছে নিই— মোদী না দিদি। সুদিন না দুর্দিন!

এবার রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতিও কমবে। অরুণ জেটলি বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলিকেও অনলাইনের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। ঠিক কী বলেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি? সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন লেনদেনে নানা সুবিধার কথা বলার শেষে সেই ইঙ্গিত দেন। একটি প্রশ্নের জবাবে রাজনৈতিক দলগুলির পাওয়া অনুদান বা চাঁদা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব রাখেন জেটলি। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন, এটা সরকারের আগামী দিনের পরিকল্পনা। জেটলির কথায়, 'এটা যদি ডিজিটাল হয়, অনুদানের পরিমাণ যদি কমে আর যদি অনেক দাতার থেকে অল্প অল্প অনুদান আসে তবে সেটা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য এক বড় দিন হবে।'

ভারতীয় আইন অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিলে তার জন্য আয়করে ছাড়ও পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালের আয়কর আইন অনুসারে ৮০ জিজিবি/ ৮০ জিজিসি ধারায় আয়করে ছাড় মেলে। দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি মোদী বিরোধিতায় সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দলেই কিন্তু এখন অনলাইনে অনুদান নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। দলের ওয়েবসাইটে আগ্রহীদের চেক বা ড্রাফট পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। নগদ নেওয়া তো রয়েছেই। আর সেখানেই চলে যত কালো কারবার। আগামী দিন কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সে যাক। দিদির কথা দিদি ভাববেন। মনে রাখবেন জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। নরেন্দ্র মোদী নোটবাতিল করে কার্যত দেশবাসীকে জলে ফেলে দিয়েছেন। ডিজিটাল লেনদেন নামক সাঁতারটা শিখে নিয়ে শীতের কষ্ট কমান। বরং ক্যাশলেস ইকোনমির মাধ্যমে উপভোগ করুন শীত।

—সুন্দর মৌলিক

সেনা অভ্যুত্থান নয়, টোলপ্লাজায় সৈনিকরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কাজই করছিলেন

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত)

দমদম বিমানবন্দরের উপরে যাত্রীবাহী বিমানটি ক্রমাগত চক্কর দিয়ে চলেছে। নামছে না কেন? যাত্রীরা উদবিগ্ন, সন্ত্রস্ত। বিমানে রয়েছেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি নির্ভীক কিন্তু ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ! এটাও কি কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে? অবশেষে বিমান অবতরণ করল।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় রওনা হয়ে গেল নবান্ন অভিমুখে। কিন্তু একি? বিদ্যাসাগর সেতুর টোলপ্লাজায় সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ট্রাকগুলির সামনের কাঁচে স্টিকার লাগাচ্ছে? সামরিক অভ্যুত্থান হলো নাকি? মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত এবং আরও ক্ষুব্ধ হলেন। নবান্নতে পৌঁছিয়েই তিনি ডেকে পাঠালেন চিফ সেক্রেটারিকে। ‘‘টোলপ্লাজায় সামরিক বাহিনীর লোক কেন? ওদের এখুনি চলে যেতে বল, আমার বিনা অনুমতিতে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও সেনা নামানো যাবে না”— এই নির্দেশ নিশ্চয়ই সেনাদের কাছে পৌঁছিয়ে ছিল। তারা কাজ বন্ধ করে দিল কিন্তু স্থান থেকে কেউই সরে গেল না। কলকাতার সেনা মুখ্যালয় থেকে জানানো হলো কর্মরত স্থানের প্রতিটি পুলিশ থানায় এই কাজের ব্যাপারে লিখিত ভাবে অভিহিত করা হয়েছে অনেক আগে। প্রতি বছরই এই সময় এই কাজটা করা হয়। কিন্তু কখনও কোনো প্রতিবাদ আসেনি অথবা কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কিছুক্ষণ পরই জানা গেল, প্রতিটি থানায় পূর্বেই জানানো হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু সরকারি ভাবে এই কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং নিষেধাজ্ঞাই দেওয়া হয়েছিল।

কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর কোনোরকম গাঁটছড়া নেই। কোনো সৈনিক কর্মরত অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও হতে পারবেন না। অবসর গ্রহণের কোনো বাধানিষেধ থাকে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সৈনিকরা রাজনীতি বোঝেন না। কারণ তাঁরাও নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী।

কিন্তু কী এমন বিশেষ কাজে সেনাবাহিনী ব্যস্ত ছিল সেটাও জানা আবশ্যক। কয়েকটি টোল প্লাজায়, যেমন হাওড়ার নতুন ব্রিজের নবান্নর নিকটে একটি টোল প্লাজা-সহ ২৯টি প্লাজার পথ দিয়ে ওই সময় সেনার কাজে লাগতে পারে এমন কতগুলি ট্রাক আসছে তার একটা সমীক্ষা করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। কারণ শত্রু যখন ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও সীমান্তের দিকে সশস্ত্র হয়ে অস্ত্র উপকরণ-সহ পৌঁছে যেতে হয়। ভারত তুলনামূলক ভাবে গরিব রাষ্ট্র। প্রয়োজনের তুলনায় তার কাছে সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য অত সংখ্যায় ট্রাক নেই। যে-কোনো ট্রাক আবার পাহাড়ি পথে ভারী জিনিস নিয়ে উঠতেও সমর্থ হয় না। তখন সাধারণ ট্রাক ভাড়া দিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়। এই কাজটা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু অত সময় সেনাবাহিনীর হাতে থাকে না। সেই জন্য প্রতি বছর সমীক্ষা চালিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয় প্রয়োজনের সময় কোথা থেকে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রয়োজনীয় ট্রাক পাওয়া যেতে পারে। অতএব রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা চিন্তা করেই সামরিকবাহিনী এই কাজটা করছিল। কারও কোনো ক্ষতি অথবা অসুবিধা করার জন্য মোটেই নয়। ‘তোলা আদায়ের’ বদনাম মনে হয় অজ্ঞতার কারণে। এটা কতখানি লজ্জার

ও অপমানের, সৈনিক ছাড়া কারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। তাদের চলে যেতে বলা হলেও তারা স্থান ত্যাগ কেন করেনি তার কারণ, যে অফিসার তাঁদের ওই কাজে নিয়োগ করেছেন, তাঁর অথবা তাঁর উপরের কোনো অফিসার আদেশ না দিলে তারা স্থান ত্যাগ করতে পারেন না।

সাধারণত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী নামানোর আগে ওইসব অঞ্চলকে উপদ্রুত অঞ্চল (ডিসটার্বড এরিয়া) হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, তার পরই সৈন্য মোতায়েন করা যাবে। কিন্তু সব সময়ই সৈন্যবাহিনীকে স্থানীয় রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সব কাজ করতে হবে। অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, কাশ্মীর, পঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্যে কাজ করার সময় রাজ্য সরকারের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে ছিলাম। যেমন প্রায়শই আমাকে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপং অথবা মুখ্যসচিব কিংবা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে হোত। তাঁরা সাদরে আমাকে গ্রহণ করতেন এবং আমার যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তার তাৎক্ষণাৎ সুরাহা করে দিতেন। অরুণাচলের এক রাজ্যপাল এতটাই স্নেহ করতেন যে রাজভবনে একটা ঘর আমার জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন রাত্রিবাসের জন্য। তিনি চাইতেন না আমি কাজ শেষ করে গভীর রাতে আবার আমার মুখ্যালয়ে ফিরে যাই (প্রায় ৫০ কিলোমিটার)। যদিও আমি কোনোদিন সেই সুযোগ গ্রহণ করিনি। আমার মুখ্যালয়ে পৌঁছে আবার তেজপুরে আলোচনার ফলাফল জানাতে হবে। মণিপুরের মুখ্যসচিব শ্রী গোস্বামী (হরিয়ানা) এবং মুখ্যমন্ত্রী রেসাংকেইসিং বলে রেখেছিলেন যখনই ইম্ফলে আসবে আমাদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাবে না। আমিও প্রয়োজন মতো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। যত ব্যস্ততাই থাক, তাঁরা আমায় বসিয়ে রাখতেন না, সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা হোত, সব সমস্যার সুরাহা হোত।

একটা কথা বিশ্বাস করতে হবে, সৈনিকদের বাঁচা-মরা সবই একমাত্র রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং দেশবাসীর কল্যাণের জন্য। কাশ্মীরের বহু মানুষ সৈন্যবাহিনীকে সহ্য করতে পারে না। তাদের উপর পাথর ছোঁড়ে, অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের চাপে। কিন্তু যখন প্রচণ্ড বন্যা কাশ্মীর উপত্যকাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তখন সেই সৈনিকরাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দিবারাত্র সেই বন্যাপীড়িতদের উদ্ধার করেছিল।

এই চিত্র ভারতের নানা প্রান্তেই বিভিন্ন রাজ্যেই দেখা যাবে। কিন্তু যেসব রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষিত হয়নি, সেইসব রাজ্যে যদি সৈন্যবাহিনীর কোনো কাজ থাকে, স্থানীয় সৈন্য মুখ্যালয়ের কোনো পদস্থ আধিকারিক রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে এবং চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারকে অবগত করাবেন। প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করা যেতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কোনো রাজ্য সরকার আমায় অথবা আমার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে অসম্মতি দেখাননি। তাঁরা বুঝতে পারতেন সৈনিকরা যে কাজই করতে চান সেটা কোনো না কোনো ভাবে রাষ্ট্রের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত।

আবার শোনা গেল, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিল নাকি? এটা একটা প্রচণ্ড গুরুতর অভিযোগ। তার সঙ্গে টোলপ্লাজায় সমীক্ষা চালানোর কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। যাঁরা বিগত ৭০ বছর পাকিস্তানে বহুবার সামরিক বাহিনীদ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ঘটনা প্রবাহ কি রূপ নেয়। ৩৭ বছরের সামরিক জীবনের অভিজ্ঞায় একটি কথাই শুধু বলতে পারি ভারতীয় সৈন্য বাহিনী বিশ্বের অন্য কোনো সৈন্যবাহিনীর মতো নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিগ্রহণের কোনো চিন্তা সামরিক কর্তৃত্বের কারো মনে কোনোদিন উদয় হয়নি, আজও নেই এবং আশা করব কোনোদিন উদয় হবেও না। বারবার সরকারি আমলাদের দ্বারা আর্থিক ক্ষতি এবং পদমর্যাদার অবনমন সত্ত্বেও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সুরক্ষায় অটল থেকেছেন। একজন অবসর প্রাপ্ত জেনারেল বলেছিলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা বেঁচে থাকব, কিন্তু আত্মসম্মান ও মর্যাদা খুইয়ে ভিক্ষা করতে পারব না। তার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়তে লড়তে প্রাণ দেওয়া অনেক শ্রেয়। আর সেই জন্যই আপামর ভারতবাসী সামরিক বাহিনীকে এত ভালোবাসেন, সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। এটাই সামরিক বাহিনীর পরম প্রাপ্তি। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের নানা বিষয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে কিন্তু তার জন্য রাষ্ট্রীয় কাজে নিষেধাজ্ঞা কেন? কোনো পক্ষের অন্যায় আদেশ পালন না করার সেনা জওয়ানদের আইনগত অধিকার আছে।

কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর কোনোরকম গাঁটছড়া নেই। কোনো সৈনিক কর্মরত অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও হতে পারবেন না। অবসর গ্রহণের কোনো বাধানিষেধ থাকে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সৈনিকরা রাজনীতি বোঝেন না। কারণ তাঁরাও নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী। সামরিক জীবনে তাঁরা শুধু জানেন মহামহিম রাষ্ট্রপতি সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তা। তাঁর নীচে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, যিনি সামরিক বাহিনীকে আদেশ নির্দেশ দেন। তার নীচেই সামরিক বাহিনী তিন অঙ্গের অধ্যক্ষরা সামরিক বাহিনীকে পরিচালিত করেন। সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করবেন, তার অর্থ নির্বাচিত মন্ত্রীদের নীচে, বুরোক্রাটদের নীচে নয়।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে কখনই কোনো অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। 'সেনাজওয়ানরা টোলপ্লাজায় 'তোলা' তুলছে'— এটা শুধুমাত্র অপমানজনকই নয়, হৃদয় বিদারক। 'এই ধরনের মন্তব্য শোনার আগে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলিতে কেন আমার নিধন হলো না'— এটাই সৈনিকদের মনের কথা। কারণ তাদের 'মোটো'— ''রাষ্ট্র এবং দেশবাসীর সুরক্ষা এবং সম্মান সবার আগে সদা এবং সব সময়, আমার নিম্নতম সৈন্যদের কল্যাণ এবং সুরক্ষা। তারপর, আমার নিজের আরাম এবং সুরক্ষা সবার শেষে সদা এবং সবসময়।''
—ফিল্ড মার্শাল স্যার চেটউড।■

পশ্চিমবঙ্গে শিশুবাজার প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল

সন্দীপ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তখন দিল্লীর যন্তরমন্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন। ঠিক সেই সময় খবর এল রাজ্যের কয়েকটি নার্সিংহোম, মানসিক প্রতিবন্ধী আবাস এবং এনজিও-র অফিসে তল্লাশি চালিয়ে সিআইডি একটি বিরাট আন্তঃরাজ্য (সম্ভবত আন্তর্জাতিকও) শিশুপাচার চক্রের হদিশ পেয়েছে। ১৩ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে ২ জন শিশুর কঙ্কাল। এত বড়ো একটি ঘটনায় সবাই যখন হতভম্ব রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা সব দোষ কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় সারলেন। এ রোগ পশ্চিমবঙ্গের নতুন নয়। এক সময় 'মেঘ করেছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না কেন'— জাতীয় অভিযোগ করে জ্যোতিবাবুরাও কেন্দ্রকে গালমন্দ করতেন। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে। চারিদিকে তাঁকে নিয়ে তামাশা করা হচ্ছে দেখে শশীদেবী পুরনো বিবৃতি পালটে জানালেন, তাঁর দপ্তর কোনোভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু তাতেও ভবী ভুলছে না দেখে শশীদেবী জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারী ও শিশুপাচার বন্ধ করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সিআইডির সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর দপ্তর অচিরেই তা গ্রহণ করবে। আপাতত জেলায় জেলায় প্রতিটি শিশু সুরক্ষা ইউনিট এবং এস এ এ-কে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লী থেকে ফিরলেন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। একে তো নোট বাতিল নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি, তার ওপর এই কাণ্ড! প্রথমেই বেশি কথা বলার জন্য শশী পাঁজাকে ধমক দিলেন কিন্তু তিনিও শিশুপাচারকে কেন্দ্র করে সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতে পারলেন না। কারণ তিন বছর ধরে পুলিশের নাকের ডগায় ৫০টি শিশু পাচার হয়ে গেল অথচ প্রশাসন জানতে পারল না, এটা হতেই পারে না। সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছিল কিনা সেটা সময় বলবে কিন্তু উদাসীনতা যে ছিল এবং উদাসীনতাও একধরনের মদত সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ঘটনার সূত্রপাত ২১ নভেম্বর। ওইদিন সিআইডির বিশেষ টিম কলকাতার শ্রীকৃষ্ণ

নার্সিংহোম, বাদুড়িয়ার সোহান নার্সিংহোম এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের একটি হোমে হানা দিয়ে ১৩ জন শিশুকে উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে দশজনের বয়েস এক বছরের নীচে। এছাড়া কয়েকটি গর্ভপাত কেন্দ্রেও হানা দেয় সিআইডি। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে শিশুপাচারের এই ব্যবসা তিন বছর ধরে চলছিল। যদিও পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশুপাচারের রমরমা সেই ন'-এর দশক থেকে। গত পাঁচ-ছ' বছরে তার বৃদ্ধি ঘটেছে ভয়াবহ রকমের। তবে সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে পর্দা ফাঁস হওয়া পাচারচক্রের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে আরও কিছু আলোকপাত প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ড্রাগ ও অপরাধ দমন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯০০০ নারী ও শিশু রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ৬০০০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় সব থেকে বেশি শিশু ও নারীপাচারের ঘটনা ঘটে।

এই পাচারচক্রটির মূল শিকার ছিল অবিবাহিতা মায়েরা এবং খুবই গরিব বাবা-মায়েরা। অভিযুক্ত নার্সিং হোমগুলি একটি এনজিও-র (সুজিত দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট) সহায়তায় জাল কাগজপত্র বানিয়ে শিশু বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি করত। কখনও কখনও আবার মাকে মৃত সন্তান প্রসব করার মিথ্যে খবর দিয়ে সেই শিশুকে মোটা দামে বিক্রি করে দেওয়া হোত। সোহান নার্সিংহোমে যে-৩টি শিশু বিস্কুটের বাক্সে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজনকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়ের নাম শহিদা বিবি। দেগঙ্গার বাসিন্দা। শহিদাকে বলা হয়েছিল তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। এই চক্রের সাহায্যকারী হিসেবে উঠে এসেছে আরও একটি এনজিও। নাম, সুবোধ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। যার মালিক সত্যজিৎ সিনহার কাজ ছিল নিঃসন্তান দম্পতিদের দত্তক পুত্রকন্যার লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে আসা। শিশুদের দাম পুলিশ বলতে না চাইলেও স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গেছে পুরুষ শিশুর দাম ৩ লক্ষ টাকা (৪,৩৮০ মার্কিন ডলার) এবং মেয়েশিশুর দাম ১ লক্ষ টাকা (১,৪৬০ মার্কিন ডলার)।

এই ঘটনার কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী মানেকা গান্ধীর দেওয়া সূত্র অনুসরণ করে সিআইডি পূর্বাশা নামের এক বৃদ্ধাশ্রম থেকে ১০টি কন্যাশিশু উদ্ধার করে। অভিযোগ, তাদের বিক্রি করার জন্য

ধরে রাখা হয়েছিল। আপাতত তারা ঠাকুরপুকুরের ইএসআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন উদ্ধার পাওয়া শিশুরা অপুষ্টি-সহ নানা অসুখে ভুগছে। যথার্থ দেখভালের অভাবেই এই অবস্থা বলে তাদের অভিযোগ। এদিকে সিআইডির তরফ থেকে বলা হয়েছে অনেকদিন ধরেই বৃদ্ধাশ্রমটি সুজিত দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট নামক এনজিও-র সঙ্গে যোগসাজশে শিশু কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সুজিত দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অফিস থেকেই ২টি শিশুর কঙ্কাল উদ্ধার করেছে সিআইডি। সম্ভবত ঠিকমতো দেখাশোনার অভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

এই নিবন্ধের শুরুতেই রাজ্যের মন্ত্রী ড. শশী পাঁজার অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং তাঁর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনকষাকষির কথা বলা হয়েছে। বস্তুত শিশু পাচারচক্র ফাঁস হওয়ার এই ঘটনা এক লহমায় সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে জনসমক্ষে তুলে এনেছে। কারণ ক্ষমতায় আসার প্রথমদিন থেকেই এই সরকার জানত পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো একটা শিল্প গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ড্রাগ ও অপরাধ দমন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯০০০ নারী ও শিশু রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ৬০০০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলায় সব থেকে বেশি শিশু ও নারীপাচারের ঘটনা ঘটে। সেই সময় প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এবং সোশিওলিগ্যাল এইড রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টারের ডিরেক্টর মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেছিলেন, 'শিশুবিক্রি এবং পাচারের প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষ।' সাম্প্রতিক শিশুপাচারের ঘটনায় তিনি মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও অন্যতম কারণ হিসেবে দেখতে চান। তাঁর মতে, সরকারি রিপোর্টে যত শিশুপাচারের ঘটনা প্রকাশিত হয় তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। কারণ বেশিরভাগ ঘটনাই পুলিশকে জানানো হয় না।

২০১১-তেই পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার সংগঠন মাসুম এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। যার সারমর্ম, বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত সালুয়া গ্রামের এক চোদ্দ বছর বয়সি কিশোরীকে পাচার করে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকবার ধর্ষিতা হবার পর মাসুমের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাদুড়িয়া থানার পুলিশ তদন্ত করা তো দূর মেয়েটির বাবাকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া শুরু করে। উদ্দেশ্য, মেয়েটিকে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা। ওই বছরেরই শেষের দিকে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন তাদের শাখাসংগঠন উত্তরপ্রদেশের গুড়িয়ার কাছ থেকে বাদুড়িয়া থানার বিরুদ্ধে আরও দুটি অভিযোগ পেয়েছিল। দুটি ক্ষেত্রে কেস ডায়েরি নং এ এইচ আর সি-ইউ এ সি-২১৪-২০১১ এবং এ এইচ আর সি-ইউ এ সি-২১৭-২০১১। ডায়েরির বয়ান অনুযায়ী, বারাণসীর নিষিদ্ধপল্লী থেকে শতাধিক কন্যাশিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে যাদের মূলত মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে পাচার করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারকে (বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল) বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বাদুড়িয়া থানাও এ ব্যাপারে ক্রমাগত অসহযোগিতা করে চলেছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত এনজিও 'ক্রাই' জানিয়েছে, দেশ থেকে বিদেশে অথবা দেশেরই বিভিন্ন রাজ্যে যত কন্যাশিশু পাচার হয় তাদের ৪২ শতাংশই আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সবার থেকে এগিয়ে। অন্য যেসব রাজ্য নারী ও শিশুপাচারের ক্ষেত্রে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে অসম, বিহার, ওড়িশা এবং হরিয়ানা।

এত পুরনো একটা ঘটনা টেনে আনার কারণ সাম্প্রতিক শিশুপাচারের ঘটনার কেন্দ্রস্থলও বাদুড়িয়া। সোহান নার্সিংহোম। সুতরাং বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ও প্রশাসন অনেক আগে থেকেই এলাকায় শিশু ও নারী পাচারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানত। বিভিন্ন সময়ে পাচার হয়ে যাওয়া শিশুর বাবা-মা বা নিষিদ্ধপল্লীতে বিক্রি করে দেওয়া হতভাগ্য কিশোরীদের ওপর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপও সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ নারী ও শিশু পাচারের সঙ্গে জড়িত ফড়ে, দালাল বা ক্রেতাদের প্রকারান্তরে সাহায্য করেছে। তাহলে একথা বলা হচ্ছে কেন, 'পুলিশ কিছু জানত না'? বা 'সরকার বিড়ম্বনার সম্মুখীন'? সরকার সব খবরই রাখত বলে মনে হয়। কিন্তু অন্য অনেক সমাজবিরোধী কাজকর্মের মতো এই পাচারের ব্যবসাও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অঙ্গুলিহেলনে চলত। তাদের দোসর ছিল কিছু অর্থপিশাচ ডাক্তার, উকিল আর কয়েকটি এনজিও। জালনোটের দালালির মতো এই ব্যবসা থেকেও শাসকদলের নেতারা সম্ভবত 'রেভেনিউ' আদায় করতেন। সেই জন্যেই সরকার এতদিন চুপ করেছিল। চুপ করেই থাকত যদি না কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের জেরে রাজ্যে কৃত্রিমভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হতো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করার জন্য দিল্লীতে ছুটতেন এবং জনৈকা রেশমা বিবি নার্সিংহোমের আরোপিত তার মেয়ের মৃত সন্তান প্রসব করার দাবি মানতে না পেরে থানায় যেতেন। বলা যেতে পারে ব্যাট আর প্যাডের ফাঁকে যে বিরাট ফাঁক তৈরি হয়েছে সরকার নিজেই সেটা জানত না। সেই ফাঁক দিয়ে বল ঢুকে স্টাম্প ছিটকে দিয়েছে।

এবার দেখা যাক ২০১৬-য়

পশ্চিমবঙ্গের কী অবস্থা। সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত এনজিও 'ক্রাই' জানিয়েছে, দেশ থেকে বিদেশে অথবা দেশেরই বিভিন্ন রাজ্যে যত কন্যাশিশু পাচার হয় তাদের ৪২ শতাংশই আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সবার থেকে এগিয়ে। অন্য যেসব রাজ্য নারী ও শিশুপাচারের ক্ষেত্রে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে অসম, বিহার, ওড়িশা এবং হরিয়ানা। তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসার ৪২ শতাংশের অংশীদার আর বাকিরা সবাই মিলে ৫৮ শতাংশের। ক্রাই-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা অতীন্দ্রনাথ দাস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যে নারী ও শিশুপাচার মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। যেসব শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে তাদের সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে বলে আমাদের অনুমান।' গত সাড়ে তিন দশকে ভারতবর্ষে যত শিশু পাচারের ঘটনা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেছে ক্রাই। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যত শিশু পাচার হয় তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই কন্যাশিশু। অবাধ এবং নিরাপদ শিশুবাজার হিসেবে সবার আগে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত পাঁচ বছরে এই বাজার ৬০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শুধু ভারতে নয় আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেও একটা রেকর্ড।

পাচারের কেন্দ্রস্থল জেলাগুলির কথা আগেই বলেছি। এখানে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল এবং সুন্দরবনের সন্দেশখালি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কলকাতা থেকে সন্দেশখালি যেতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে। সুন্দরবনের এই দ্বীপটি আগে বাঘের উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন বাঘের থেকেও বড় সমস্যা মানুষ পাচার। কয়েক মাস আগে বিদেশমন্ত্রকের দেওয়া একটি খবর অনুযায়ী সন্দেশখালি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ৮০০০ মেয়ে (যাদের বয়েস ৫ থেকে ১৫ বছর) হারিয়ে গেছে। এছাড়া প্রায় ৫৫০০ পুরুষও নিখোঁজ বলে অভিযোগ।

বস্তুত যারা মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা করে তাদের কাছে সন্দেশখালি 'সোর্স এরিয়া' হিসেবে পরিচিত। গত দশ বছরে বাড়ির কোনো মেয়ে নিখোঁজ হয়নি এমন পরিবার সম্ভবত সন্দেশখালিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০০৯ সালে আয়লার তাণ্ডবে এই অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখানকার মানুষজনকে সবদিক থেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। ভয়াবহ দারিদ্র্য, একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার, অসুখ-বিসুখ, সরকারের প্রতিশ্রুতি ও উদাসীনতা ইত্যাদি নানা কারণে আজ এখানকার মানুষ টাকা পেলে যে-কোনো কাজ করতে রাজি। এমনকী টাকার জন্য কোলের শিশুকে পরের হাতে তুলে দিতেও তারা পিছপা নন। কিন্তু মুশকিল হলো অভাবের সুযোগ নিয়ে অনেকেই এদের ঠকায়। সবিতা মণ্ডলের (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে কথা হলো। চার বছর আগে এক ফড়ে এসে তার মেয়ে রূপাকে চাকরির লোভ দেখায়। বলা হয়েছিল প্রতি মাসে রূপার মাইনে সরাসরি সবিতাদেবীর কাছে পৌঁছে যাবে। সবিতাদেবী বলেন, 'ওরা এক বছরের জন্য রূপাকে নিয়ে গেল। তারপর দুর্গাপুজো গেল, কালীপুজো গেল, বছরের পর বছর চলে গেল কিন্তু মেয়ে আমার ফিরল না।' সবিতাদেবীর দুই কন্যা-সহ আরও চার সন্তান রয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের মতোই দুর্বিষহ। সুতরাং আর একজন ফড়ে যদি একইরকম চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে আর একজন মেয়েকে পাঠানো ছাড়া সবিতাদেবীর অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে শিশুপাচারের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে ধুঁকতে থাকা চা-বাগানগুলো। সম্প্রতি মাদারিহাট এবং কালচিনিতে একটি সমীক্ষা সংগঠিত হয়েছিল। যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে পরিষ্কার, অভাবের কারণে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা অসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৩০০০ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ জানিয়েছে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ভয়াবহ দারিদ্র্যই তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ। সমস্যা হলো, স্কুলছুটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভুয়ো 'প্লেসমেন্ট এজেন্সির' সংখ্যাও। বেকার শ্রমিকদের স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের এরা নানারকম চাকরির লোভ দেখিয়ে তাদের দিল্লী মুম্বই বেঙ্গালুরুর মতো বড়ো বড়ো শহরে বিক্রি করে দিচ্ছে। মেয়েদের স্থান হচ্ছে নিষিদ্ধপল্লীতে আর ছেলেরা চলে যাচ্ছে বাড়ির চাকর-বাকরের কাজ করতে। সাধারণত যাদের বিক্রি করে দেওয়া হয় তারা আর ফিরে আসতে পারে না। ভাগ্যক্রমে কেউ যদি ফিরে আসেও তার অবস্থা হয় শোচনীয়। অভাব তো আছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে যথার্থ পুনর্বাসনের অভাবও।

সর্বত্র একটি নেতিবাচক পরিস্থিতি। আইন শৃঙ্খলা থেকেও নেই। সরকার উদাসীন। সাম্প্রতিক শিশুপাচারের তদন্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদলীয় কমিটি গড়েছেন। ভালো কথা। কমিটি তদন্ত করুক। কিন্তু এতদিন আপনারা কী করছিলেন! এই সমস্যা তো একদিনে তৈরি হয়নি। বিদেশি দম্পতিরা পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, ফিরছেন ভারতীয় শিশু দত্তক নিয়ে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দত্তকগ্রহণ নীতি অতি সরলীকৃত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তা করেছেন। কাদের স্বার্থে করেছেন আমাদের জানা নেই। এ প্রসঙ্গে পেশায় আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দত্তক গ্রহণের পদ্ধতি আগে জটিল ছিল, এখন খুবই সহজ। নতুন আইন জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের জন্য পদ্ধতি সোজা হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে, টাকার জন্যেই করেছে।'

প্রশ্ন হলো, তা হলে সরকার এর দায় অস্বীকার করবে কী করে? বিস্তীর্ণ একটি অঞ্চলে শিশু পাচারের এমন বাজার গড়ে উঠল আর সরকার জানতে পারল না, তা হতেই পারে না। বামফ্রন্ট যে সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের কাজ শুরু করেছিল এই সরকারও তার ১০০ শতাংশের অংশীদার। রং যতই বদলাক না কেন। সুতরাং শিশুপাচার চলছে, চলবে। মাঝে মাঝে একটু আধটু হৈচৈ হবে। লোকে আবার ভুলেও যাবে।

■

মানবসভ্যতার চরম অবক্ষয়

পণ্য হয়ে যাচ্ছে মানবশিশু

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

খবরের কাগজে মনে ক্লেশ উৎপন্ন করা খবরের সারিতে নবতম সংযোজন হয়েছে এই রাজ্যে মানবশিশুর পণ্য হয়ে ওঠার নিত্যদিনের বিবরণ। আগে জীবিত প্রাণীর কেনা-বেচার খবরে থাকত অরণ্য থেকে চোরাপথে আনা পশুপাখি, তাদের দেহাংশ বা চিড়িয়াখানা থেকে চুরি করে আনা বিভিন্ন প্রাণী। এদের দেশ বিদেশের বাজারে বিক্রি করা হোত। মানুষও বিক্রি হোত। দাস বা দাসী হিসাবে, মনোরঞ্জনের পণ্য হিসাবে, যেমন আরব দেশগুলিতে উটের গলায় বেঁধে উট-দৌড় করানোর জন্য ছোট ছেলেদের বিক্রি করা বা পতিতালয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়েদের বিক্রি হওয়া। কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুর বিক্রি হওয়া, বিশেষ করে এক সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে বাজার তৈরি করে বিক্রি হওয়ার ঘটনা আগে কখনও ছিল কিনা জানি না।

শিশুপণ্যের বাজার তৈরির নেপথ্যে প্রধান কারক হিসাবে উঠে আসছে কিছু চিকিৎসকের নাম যারা পীড়িত মানুষকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করবে, সমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে এমন শপথ গ্রহণ করেছিল সেই পেশাতে নিযুক্ত বিশ্বজোড়া অন্যান্য সব চিকিৎসকদের মতোই। কিন্তু অপরিমিত ভোগ ও লালসার কুহকে পড়ে সেই শপথবাক্য ভুলে, নিজেদের বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে আজ তারা ফাঁদ পেতে ধরছে কিছু সরল বিশ্বাসী অসন্দিগ্ধ হতভাগিনীদের যারা সন্তানের মুখ দেখার আশায় তাদের শরণ নিয়েছে।

সৃষ্টির নিয়মেই পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির মতো মানবজাতিও টিকে আছে সন্তানের মধ্য দিয়ে বংশপরম্পরা রক্ষা করে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা দেয় যখন কোনো দম্পতির সন্তানের আশা পূর্ণ হয় না, তারা সন্তানহীন হয়ে থাকে। তখন চেষ্টা হয় অন্যের সন্তান দত্তক নেওয়ার আর এই রন্ধ্রপথেই ঢুকে পড়ে চিকিৎসকের মুখোশধারী সেইসব মানবশিশুকে পণ্য করার কারবারিরা। সহযোগী হিসাবে এরা খুঁজে নেয় কিছু বিবেকহীন আয়া, সেবক, নার্স, উকিল, পুরকর্মী, মানবসেবায় স্বয়ংনিযুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মতো মানুষ ও সংস্থাকে ও গড়ে তোলে নিজেদের চক্র।

মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সমাজে আছে সন্তানের দায়বহনে অনাগ্রহী

কিছু জননী। এর নেপথ্যে কারণ থাকে কখনও সামাজিক, কখনও শারীরিক আবার কখনও বা আর্থিক। আমরা কুন্তী ও তাঁর পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণের উপাখ্যান জানি। কর্ণের পালক পিতামাতা অধিরথ ও রাধার কথাও জানি। এ ধরনের ঘটনায় অর্থের লেনদেনের ব্যাপারই থাকে না। অনেক সময়ে বহু সন্তানের জনক ও জননী তাদের যথাযথভাবে পালনে অশক্ত হয়ে পড়লে কোনো সন্তানহীন পরিচিত অথবা

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯
সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

আত্মীয়কে নিজের সন্তান দত্তক দিচ্ছে এমনটাও ঘটে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কোথাওই অর্থের বিনিময়ে সন্তান আদানপ্রদান হয় না। এ ধরনের ঘটনা চিন্তা ও ভয়ের উদ্রেক করে না। মনে দুঃখ, ভয় ও হতাশা তখনই জাগে যখন দেখি দশমাস গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করে সন্তানের মুখদর্শনের অপেক্ষায় থাকা মা ও তাদের পরিবারবর্গ প্রতারিত হচ্ছে, তাদের জীবিত সন্তানকে মৃত ঘোষণা করে অন্যের কাছে তা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের সরলতা, বিশ্বাস, নির্ভরতা আজ উপেক্ষা ও প্রতারণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

জননী শুধু সন্তানের জন্মই দেয় না, সন্তান পালনও করে। মায়ের কোলে থেকে মাতৃস্তন্যে লালিত, মায়ের যত্নে পালিত শিশুর শরীর ও মন মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বড় হয়ে ওঠা শিশুর তুলনায় অনেক বেশি পরিণত ও পুষ্ট হয়। মায়ের স্নেহময় সান্নিধ্য সব বয়সের সন্তানের কাছেই এক বড় প্রাপ্তি। সেই সান্নিধ্য না পাওয়া সন্তানেরা অবশ্যই দুর্ভাগা। একেবারে জন্মলগ্নে নিরপরাধ কোনো শিশুকে সেই দুর্ভাগ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার পাপ সমাজদেহে ভালভাবে বাসা বাঁধবার আগেই তাকে নির্মূল করা না হলে সমাজ ছারখার হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকার শিশু পাচার রোধে সম্প্রতি এক বিশেষ অভিজ্ঞ মন্ত্রীকে শীর্ষে রেখে কমিটি গঠন করেছে। আশা করা যায় এর ফলে এই ঘৃণ্য অপরাধ নিয়ন্ত্রিত হবে। এই অপরাধে জড়িত ব্যক্তিরা যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি ভুয়ো কাগজপত্রের মাধ্যমে কোনো শিশুকে ক্রয় করেছে তাদেরও চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে তাদেরও কারাবাস হবে এবং শিশুটি তার প্রকৃত পিতামাতার কাছে ফিরতে পারবে। যেসব ডাক্তার এ কাজে যুক্ত তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে তাদের ডাক্তারি পেশারও ইতি ঘটানোর কথাও ঘোষণা হয়েছে। এদের শাস্তি দৃষ্টান্তমূলকই হওয়া উচিত।

পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণার পর যেমন পথে, ঘাটে, আস্তাকুঁড়ে, নদীতে লক্ষ লক্ষ টাকার বাতিল নোট কাটা, ছেঁড়া, জ্বালানো বা ভাসানো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তেমনই শিশুপণ্য রোধে সরকার নড়েচড়ে বসায় চুরি করা শিশুদের চোরেরা পথে ঘাটে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। সেইসব শিশুদের আপাতত বিভিন্ন হোমে রাখা হলেও আশা করা যায় একসময় তারা তাদের প্রকৃত মাতাপিতার কাছে ফিরে যেতে পারবে। শুধু যে সব ক্ষীণপ্রাণ সদ্যোজাতেরা চোরের হাতে উপযুক্ত যত্ন না পেয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের জন্য দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার রইল না। তবে যাদের অবহেলায় এই মৃত্যু ঘটেছে, তাদের হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে বিচার হবে এই যা সান্ত্বনা।

চারিদিকের এই শিশুচুরি হওয়া, তাদের পণ্য হিসেবে বিক্রি করা, অপহৃত নবজাতকদের মৃত্যু ও তাদের প্রোথিত দেহের কঙ্কাল উদ্ধার বা শীতের রাতে আস্তাকুড়ে ফেলে যাওয়া, শিশু-উদ্ধারের ঘটনার খবরের মধ্যেই দাসী হিসাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া এক মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া তার দু' বছরের শিশুপুত্রকে সেই মায়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে আসার পর আবার ফিরে পাওয়ার ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে সমাজে যেমন ভয়ঙ্কর ও আসুরিক মনের লোকেরা আছে তেমনই আছে সংবেদনশীল মমতাময় প্রাণও। জয় হোক্ সেই সংবেদনশীলতার, জয় হোক্ সেই মানবিকতার।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

চিঠিপত্র

হালাল সংস্থার জিনিস কেনা দেশের হালত খারাপ করা

আমরা চীনের তৈরি জিনিস বর্জন করে ভারতের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করতে চাইছি এবং সন্ত্রাসবাদের মূলকেন্দ্র পাকিস্তান ও বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করার কারণে চীনকে শিক্ষা দিতে চাইছি। কিন্তু সচেতনতার অভাব ও অজ্ঞতার কারণে আমরাই বিভিন্ন দোকান ও প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে হালাল দ্রব্য কেনার মাধ্যমে প্রতিদিনই বিরাট অঙ্কের টাকা বিভিন্ন হালাল সংস্থার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে পাঠাচ্ছি। নিজেরাই নিজেকে মারার জন্য গুলি, বন্দুক কেনার টাকা ঘুরপথে শত্রুর নিকট পাঠাচ্ছি। অনেকেই জানি না আসলে হালাল দ্রব্য বা জিনিসটা কী? হালাল সংস্থাই বা কী? আবার হালাল ব্যবসাটাই বা কী?

ব্যাপারটা একটু বোঝা যাক। হালাল হলো ইসলামিয় রীতি অনুসারে কয়েকটি জিনিস— যেমন মদ, শূকরের মাংস ও চর্বি, নেশা দ্রব্য, কৃত্রিম রং ও এক কোপে পশুর গলা কেটে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, হারাম বা খারাপ। এছাড়া বাকি সব খাদ্য ও জিনিস হালাল। অর্থাৎ অনুমোদিত বা ভালো। হালাল সংস্থা প্রতিটি দেশে মুসলমান উপভোক্তাদের হালাল দ্রব্য বেচা ও কেনার সুবিধার জন্য এবং প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি হালাল কিনা, তাদের তৈরি দ্রব্যগুলি হালাল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যে বিভিন্ন মুসলমান সংস্থা দেশের মধ্যে এক বা একাধিক হালাল সংস্থা গড়ে তুলেছে। এই হালাল সংস্থাগুলির নিজস্ব দপ্তর, রাসায়নিক পরীক্ষাগার রয়েছে, এতে বেশকিছু কর্মচারী রয়েছে। এই সব সংস্থার নিজস্ব প্রতীক রয়েছে। এদের কাজ হলো কোনো প্রস্তুতকারক সংস্থা যদি এদের কাছে এসে তার উৎপাদিত দ্রব্যের অনুমোদন চায় তবে এরা প্রস্তুতকারক সংস্থার পরিবেশ, বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত দ্রব্যের কাঁচামাল ইত্যাদি হালাল কিনা যাচাই করে উৎপাদিত দ্রব্যের মোড়কে ওই সংস্থাকে হালাল প্রতীক লাগাবার অনুমতি দেয়। এক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটাই জটিল, অর্থ নির্ভর ও ব্যয়বহুল। কোনো প্রস্তুতকারক সংস্থার কোনো দ্রব্যের হালাল হিসাবে অনুমোদন পাওয়াটাও সময় নির্ভর ও অর্থ নির্ভর, অর্থাৎ কোনো দ্রব্য হালাল হিসাবে ছয়মাস অনুমোদনের জন্য যে পরিমাণ টাকা ওই হালাল সংস্থাগুলিকে দিতে হয়, এক বছরের জন্য অনুমোদন পেতে গেলে তার দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক সংস্থাকে বিভিন্ন ধাপে টাকা দিতে হয় ওই সংস্থাটিকে হালাল হিসাবে অনুমোদন নেওয়ার জন্য। আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক সংস্থার কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের প্রত্যেকটি নমুনাতে হালাল প্রতীক লাগানোর জন্যও টাকা দিতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কোনো প্রামাণ্য নথি থাকে না। আবার অনেক হালাল অনুমোদিত সংস্থা অমুসলমান দেশগুলিতে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক কারণে হালাল প্রতীক মোড়কে না লাগিয়ে ব্যবসা করে। উদ্দেশ্য অমুসলমান উপভোক্তাদের কোনো দ্রব্য হালাল কিনা তা বুঝতে না দেওয়া। এইভাবে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। যেমন একটি বিস্কুটের প্যাকেট আপনি দশ টাকায় কিনতে পারতেন, কিন্তু ওই প্রস্তুতকারক সংস্থার বিস্কুটটি হালাল হিসাবে অনুমোদন নেওয়ার সময় হালাল সংস্থাগুলিকে টাকা দেওয়ায় বিস্কুট প্যাকেটের দাম বারো টাকা ধার্য করেছে, অর্থাৎ আপনি দু' টাকা হালাল কর দিচ্ছেন। এই কর হালাল সংস্থাগুলি ইসলামের বিস্তারের জন্য ব্যবহার করে (যেমন মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ)। এর একটি অংশ ঘুরপথে বা সরাসরি ইসলামিক জিহাদ তহবিলে যায়, যার মাধ্যমে জিহাদের জন্য অস্ত্র কেনা ও জিহাদি নির্মাণে সাহায্য করে। অর্থাৎ অমুসলমানরা হালাল দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে নিজেদের অজান্তে ইসলামিক জিহাদ তহবিলে অর্থ প্রদান করছে। মুসলমানদেশে ব্যবসা করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো, তা হালাল হতে হবে। কিন্তু অমুসলমান দেশগুলিতে ব্যবসা করার আবশ্যক শর্ত হালাল নয়। হালাল দ্রব্য কেনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান (হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি) লোকেরা প্রতিদিন বিরাট অঙ্কের টাকা সংস্থাগুলিকে হালাল কর হিসাবে প্রদান করে। যার উদাহরণ ভারত ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। ভারতে যেসব প্রস্তুতকারক সংস্থা সবচেয়ে বেশি হালাল কর দেয় তাতে Nestle রয়েছে প্রথমস্থানে। এই ব্যাপারে বিশদে জানতে www.halalcertificate.in ওয়েবপেজটি দেখুন। আরও জানতে www.halalindia.co.in দেখুন। অথচ ভারতের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা Nestle এর তৈরি ম্যাগি, চকোলেট, বেবি ফুড খেয়েই যাচ্ছে, অন্য প্রস্তুতকারক সংস্থার একইরকম উন্নত গুণমানের প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও। নিজেদের দেশপ্রেমিক ও বুদ্ধিমান মনে করা লোকেরা নেসকাফে কফি ছাড়া অন্য উষ্ণ পানীয় ভাবতেই পারেন না। শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণে হালাল দ্রব্য কেনার মাধ্যমে আমাদের টাকা সন্ত্রাসবাদীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই আসুন, সবাই মিলে হালাল অনুমোদিত দ্রব্য ও চীনের তৈরি দ্রব্য কেনা থেকে দূরে থাকি।

—শঙ্করনাথ ওঝা,
কাঁথি।

তালাক প্রথা ও তৃণমূল কংগ্রেস

পার্কসার্কাস ময়দানে 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' তালাক প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সভা করেছে। তালাক প্রথায় বলছে কোনো স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীকে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে বলেন,

তাহলে ওই স্ত্রীর স্বামীর ঘর করার অধিকার থাকে না। তিনি পরে কাউকে বিয়ে (নিকা) করলেও দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করার পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাঁকে আবার তিন তালাক দেন তবে ওই স্ত্রী প্রথম স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারেন। প্রথমত, এই প্রথায় স্ত্রীর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না, এর বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীর মতো আদালতে যাওয়া যায় না।

যে নিয়মে আবার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসা যায় তা যে নারীর কাছে কতটা বিড়ম্বনার ও আত্মমর্যাদাহানিকর তা তালাকদানকারী পুরুষতান্ত্রিক এই মুসলিম ল বোর্ড বোঝে না বলে এই সভা করেছে এবং মুসলমান ভোট ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেওয়া মমতা ব্যানার্জীও তাদের সভা করতে দিয়েছেন। ওই সভায় পার্থবাবু তাঁদের তালাক প্রথার সমর্থন করেছেন। ধিক্! নারীর সম্ভ্রম লুঠকারীদের ধিক্।

এই তালাকপ্রথা পাকিস্তানেও নিষিদ্ধ বলে শুনেছি। তুরস্ক প্রভৃতি বহু মুসলমান দেশও এই প্রথা ও মুসলমান পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথা তুলে দিয়েছে। তাহলে কেবলমাত্র ভারতের জন্য এই প্রথাগুলি থাকতে পারে না। এরা ভারতে মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথা রাখতে চায় ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পাঠান ও মোগল যুগের মতো হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করার ইচ্ছায়। ওদের ধোঁকায় ভুলবেন না, রুখে দাঁড়ান হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে।

এই প্রথার সমর্থনকারীদের হিন্দুরা যেন নিজেদের সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে একটিও ভোট না দেন এই অনুরোধ।

—**হৃষীকেশ কর,**
সল্টলেক।

আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি

'আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি' (স্বস্তিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৩) রচনায় পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দুদের, বিশেষ করে হিন্দু নারীর অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অপমানের কথা বিশদভাবে জানা গেল। খোলাখুলিভাবে আরও জানা গেল হিন্দু জাতির সার্বিক দুর্বলতা এবং তা গোষ্ঠীগত অনৈক্যের হেতু। সকলের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য এই ঐতিহাসিক বিবরণ পশ্চিমবঙ্গের অসাড়চিত্ত হিন্দুর জ্ঞানচোখ খুলে দিক। অতীত এবং এদেশে দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় লেখক ঠিকই বুঝেছেন যে এ পারের সমাজজীবনও ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হিন্দুর আত্মঘাতী উদাসীনতা। ভারত ভাঙার পরই ওপারে যখন সরকারি মদতে পুরোদমে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধন, নারী নির্যাতন এবং ইসলামিকরণ চলছে কয়েক দশক ধরে, তখন এপারে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা রোমান্টিক সাহিত্য, সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্প চর্চায় মগ্ন থেকে মেডেল জয়ে এবং বিশ্বের হাততালি কুড়োতে মত্ত। ওপারের ধ্বংসলীলা তাঁদের সামান্যতম সাড়াও জাগায় না। প্রশাসন ও সারস্বত সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যবাদের ধ্বজা ধরে এবং সংখ্যালঘু তোষণে মত্ত হয়ে মৈত্রীর সেতুবন্ধনের নামে আখের গোছাতে ব্যস্ত। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের যে, বিতাড়িত ছিন্নমূল হিন্দুরা এপারে এসে সব ভুলে কমিউনিস্টদের আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমান তোষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তা আজও চলেছে। নেকড়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর টুকরো প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রায় পঁচিশ শতাংশ মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি করে মুসলমান প্রধান জেলাগুলোতে হিন্দুর উপর সবরকমের অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থা হিন্দুকেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে মৈত্রী ও সহনশীলতার বাণীর মন্ত্র দিয়ে চলেছে।

আসলে রাজনৈতিক চিন্তায় দেউলিয়া হিন্দু অন্যায়ের প্রতিবাদেও শেষ প্রায়। নির্বাচনে একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল বিজেপিকে প্রতিনিধিত্বদানই এই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। এই লক্ষ্যে প্রতিটি হিন্দুকে সচেষ্ট হতে হবে। আত্মসমীক্ষা এবং জাগরণই একমাত্র পথ। তাতেই জাতি, দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। ঐতিহাসিক সত্যে নির্দিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মহত্যার নামান্তর। অন্যথায় হিন্দুকে সুদেমূলে হিসাব চুকাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের সাবধানবাণী প্রতি মুহূর্তে স্মরণীয় : 'ভারত যদি মরে যায়, তবে সত্যের মৃত্যু ঘটবে, ধর্মের মৃত্যু ঘটবে, যত উচ্চ চিন্তা তার মৃত্যু ঘটবে।' স্বার্থপুষ্ট রাজনীতির পাপে শুধু হিন্দুই ধ্বংস হবে না, প্রতিষ্ঠা পাবে ইসলামের জঙ্গিহানা। বিশ্বের সমস্ত দেশ, এমনকী মুসলমান দেশগুলোও আগ্রাসী ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। উগ্রপন্থী ইসলামের সঙ্গে আপোশে মীমাংসা, সহাবস্থানের চিন্তা বা তাদের মনের পরিবর্তন চিন্তা আকাশ কুসুম কল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ।

'দেশান্তর' কাহিনিতেও উত্তর ২৪ পরগনার 'দেগঙ্গা'য় হিন্দু নিধন ও নারী নির্যাতনের বাস্তব ঘটনার বিবরণ আছে যা সকলেরই অবশ্য পাঠ্য।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,**
তারকেশ্বর, হুগলী।

প্রসঙ্গ—কাবা মসজিদ

বিমলেন্দু ঘোষ মহাশয়ের লেখার (স্বস্তিকা ৭.১১.১৬) পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখা শ্রী ঘোষ লিখেছেন, 'কাবা শিবমন্দির ছিল তা বলা যায় না।' আবার উল্লেখ করেছেন—'মক্কা দখলের পর হজরত মহম্মদ কাবা মসজিদে গিয়ে লাঠির সাহায্যে পবিত্রকৃষ্ণ প্রস্তরকে চুম্বন করেন। কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। ভিতরে ঢুকে অভ্যন্তরস্থ দেব-দেবীর বিগ্রহগুলি ধ্বংস করেন। 'তাঁর লেখাতেই আবার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কোন সম্প্রদায় দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে পুজো করেন? হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও কি মূর্তি গড়িয়ে পুজোর প্রচলন আছে? হজরত মহম্মদের পূর্বে অর্থাৎ হজরতের বাবা, ঠাকুরদা কোন ধর্মের ছিল? এখনও যারা হজ করতে যায় তারা মস্তক মুণ্ডন করে কাবা মসজিদে ঢুকে ওই পাথরকে সাতবার প্রদক্ষিণ এবং চুম্বন করেন।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, কোচবিহার।

১০৮ ফুট শিবমূর্তি

মরিশাস : ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ

লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা

মরিশাসকে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ কেন বলা হয় সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের আমার বন্ধু প্রচারক অমরকৃষ্ণ ভদ্র দীর্ঘদিন ধরে মরিশাসে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। স্বর্গীয় মাধবদা (মাধবরাও বানহাট্টি)-র এক কালের কার্যক্ষেত্রের সঙ্ঘ শাখার এবং আমার আরম্ভ করা বিদ্যা ভারতীর বিদ্যালয়ের অবস্থা জানার ও চাক্ষুষ করার ইচ্ছাই তাঁর এই সুযোগ এনে দেয়। আমার মরিশাস ভ্রমণের কথা জানতে পেরেই অমরদার সেই সুপ্ত ইচ্ছা জেগে ওঠে। পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা এবং সঙ্ঘ অধিকারীদের সম্মতি নিয়ে আমাদের এই যাত্রার কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। মরিশাসের হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী সঙ্গীতা সৌলিকের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ছিল আমার এই যাত্রা। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতে থাকাকালীন আমি মেয়েটির স্থানীয় অভিভাবক ছিলাম। তাই তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আমি নাগপুর থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে উঠি। অমরদা হাওড়া থেকে একই ট্রেনে আসেন। আকোলা স্টেশনে বিদ্যা ভারতীর বিদর্ভ প্রান্তের কার্যকর্তা আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা করেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা মুম্বইয়ে পরেল-স্থিত যশবন্ত ভবনের সঙ্ঘ কার্যালয়ে পৌঁছলাম।

মরিশাসের সহ সঙ্ঘচালক আত্মানন্দজীর অনুরোধক্রমে ঘোষ বিভাগের ৪টি আনক ও ৫০টি বংশী ও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করতেই দু'দিন কেটে গেল। ২ আগস্ট রাত ১২টায় বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। সারারাত প্যাকিং, চেকিং, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দীর্ঘ অপেক্ষার পর ৩ আগস্ট সকাল ৬-৪৫ মিনিটে আমাদের বিমান রওনা হলো। ৩০০-র বেশি যাত্রী-সহ এয়ার মরিশাসের বিমানে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার যাত্রা।

শিবসাগর রামগুলাম বিমানবন্দরে নামার পূর্বেই মরিশাসের সবুজ বনের আড়াল দিয়ে বেশ কিছু অট্টালিকা চোখে পড়লে। বিমান অবতরণ করার পর জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে অল্প সময় অপেক্ষার পর শ্রীমতী বিনু অরুণ ও স্বামী রামায়ণ সেন্টারের প্রমুখ তাঁর স্বামী রাজেন্দ্র অরুণ আমাদের স্বাগত জানিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। স্নান, জলপানের পর যে বাড়িতে আগামী ৪ দিন আমাদের থাকার কথা, সেই কুন্তীবোনের বাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিলেন হরিনাথজী।

তৃতীয় দিনে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী আমাদের সন্ধান নিয়ে এই বাড়িতে আমাদের রক্তের নমুনা নিতে আসে। মরিশাসে বিদেশ থেকে আসা সমস্ত প্রবাসীর রক্ত ও বাসস্থানের যাচাই করার এই নিখুঁত ব্যবস্থার কথা জেনে অবাক হলাম। বিশেষ করে ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগ এবং অবাঞ্ছিত লোক যাতে দেশে প্রবেশ না করে তার সাবধানতাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সঙ্গীতাদির বড় মেয়ের বাড়িতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের সমুদ্রতট, গঙ্গামাই মন্দির দেখার সুযোগ হলো। সমুদ্রতটে বেড়াতে আসা যুবকদের বাংলাকথা শুনে কৌতূহলবশত তাদের পরিচয় জানতে চাইলাম। শুনে অবাক হলাম যে, ৩০০-র বেশি বাংলাদেশি যুবক ইদানীং চিনি মিলে বা অন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকরি সূত্রে মরিশাসে থাকে। সঙ্গীতাদির মেয়ের বাড়ি ও শেষে ইস্কনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির দেখে আমরা বাসস্থানে ফিরে এলাম।

আমাদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন বিয়েবাড়ির ব্যস্ততার দিন। গায়ে

হলুদের দিনে ভোজপুরী গানের মাধ্যমে বাড়ির লোক ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের পরিচয় করিয়ে প্রায় ১৫০০ লোকের উপস্থিতিতে কন্যার গালে ও হাতে হলুদ মাখিয়ে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। ৩ ঘণ্টারও বেশি সময়ের এই অনুষ্ঠান আত্মীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানে সপত্নী প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ মহোদয়ের প্রায় দু' ঘণ্টা উপস্থিত থাকা আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক হলেও সঙ্গীতাদির পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ তা সহজে বুঝতে পারা যায়। মরিশাস দেশে পুরোহিত বিশ্বামিত্রজীর উচ্চারিত মন্ত্রে জম্বুদ্বীপে, ভারতখণ্ডে, আর্যাবর্তে, শুভলগ্নে, শুভমুহূর্তে ইত্যাদি শব্দ শুনে ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে ৫৮৩৫ কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভারতে থাকারই অনুভূতি হচ্ছিল। সাতপাকে বাঁধার এক-একটা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে পুরোহিত গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ অবস্থার বর্ণনা করছিলেন যা আমাদের কাছে অভিনব ছিল। আমরা মরিশাসকে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা আস্ত ভারত যাই বলি না কেন, মন্ত্রে কিন্তু মরিশাসকে ভারতের অঙ্গ বলেই গণ্য করা হয়েছে। মরিশাসে সাধারণ ভাবে শনি ও রবিবারই বিয়েরদিন বলে ধরা হয়। সেই দিন ভালো মুহূর্ত দেখে সমস্ত বিধি-বিধান পালন করা হয়। বিবাহ পর্বের তৃতীয় দিনে ঘরোয়া পরিবেশে বৌভাতের আয়োজন জমজমাট ছিল। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে অশ্লীল নাচ-গান, কান ফাটানো আতশবাজি বা বাজনা এবং নোংরা পরিবেশের কোনো স্থান ছিল না। ভারতীয়দের কাছে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ মরিশাসের এই পরিবেশ আমাদের অনুকরণযোগ্য বলে মনে হলো।

একই দিনে অর্থাৎ আমাদের আগমনের পঞ্চম দিনে ভারত থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা আনক ও বংশীর সদুপযোগ হলো। সকাল ৯-৩০ মিনিটে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পথসঞ্চলন ও গুরুপূজনের কার্যক্রমে আমরা উপস্থিত ছিলাম। ঘোষের তালে সঞ্চলন হলো। ৮০-র বেশি স্বয়ংসেবক ও সেবিকার সঙ্গে বিশ্ব বিভাগের সহ সংযোজক শ্রীরাম বৈদ্যও এই সঞ্চলনে যোগ দিয়েছেন। আমরা দর্শক। সেবিকারা বংশী ও স্বয়ংসেবকেরা আনক বাজিয়ে পথসঞ্চলনে যোগ দিয়েছেন। সঞ্চলনের শেষে গুরুপূজন আরম্ভ হলো। সমবেত গীত, একক গীত, বৌদ্ধিক ও প্রার্থনার শেষে শতাধিক সংখ্যায় সহ-ভোজন ছিল পূর্বনির্ধারিত।

মরিশাস প্রবাসের ষষ্ঠ দিনে চিন্ময় মিশন আশ্রমের শান্ত পবিত্র পরিবেশে আমরা পৌঁছলাম। আমার পূর্ব পরিচিত কেরলের স্বয়ংসেবক প্রকাশ মেনন আশ্রম থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন। আতিথ্য গ্রহণ করা বাড়ির মা, মেয়ে, নাতনি অর্থাৎ শ্রীমতী কুন্তী রামটহল, তাঁর মেয়ে কবিতা ও নাতনি যমুনা (যমুনা বর্তমানে জে এন ইউ-তে আমার অভিভাবকত্বে অধ্যয়নরত) এবং আমরা তিনজন মিলে ভাড়া গাড়ি নিয়েছিলাম। মরিশাসের মহাতীর্থ 'গঙ্গা তালাও' ছিল আমাদের প্রথম গন্তব্য। চোখে পড়লো ১০৮ ফুট উঁচু বিশাল শিব মূর্তি, তারই বাঁম পাশে নির্মীয়মাণ মা দুর্গার মূর্তি। তাও ১০৮ ফুট। দুটো মূর্তির মাঝখানের রাস্তা দিয়ে গঙ্গা তালাওয়ের পাড়ে প্রবেশ করলাম। সোমবার শিবের দিন। ভক্তদের সমাগমে আমরা গঙ্গা তালাওয়ে তর্পণ সেরে ও পূজা দিয়ে চারিপাশের মূর্তি ও মন্দির দর্শন করে পূজা দিলাম। ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে গঙ্গাজল এনে এই তালাওয়ে ঢালা হয় যাতে এর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে। গঙ্গাতালাওকে পরি তালাও-ও বলা হয়। কোনো পরির গালে প্রস্ফুটিত তিলের মতোই এই তালাওয়ের ভিতরেও ছোট্ট সবুজ ভূখণ্ড এই তালাওকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তালাওয়ে মাছগুলোকে খাইয়ে অমরদা মন্তব্য করলেন যে, সমুদ্রের তুলনায় এখানকার মাছ নির্ভীক ও শান্ত।

সাত রঙের মাটির দর্শনীয় স্থল, বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রতট, অখণ্ড ঝরনা, কয়েকটা চা বাগান, চিনির কারখানা, মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বারা, রাস্তার দু'ধারে বিরাট-বিরাট গাছ, সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা, পায়খানা-পেচ্ছাব তো দূরের কথা, থু-থু পর্যন্ত রাস্তায় না ফেলার অভ্যাস, দুর্ঘটনা মুক্ত যাতায়াত এবং চারিদিকে আখের চাষ বহু সময় ধরে দেখা হলো। বিকালের দিকে কৃষ্ণানন্দ সেবা আশ্রমে পৌঁছলাম। শ্রী সূর্যদেব বিসেসরের সভাপতিত্বে হিউম্যান সার্ভিস ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত অনাথ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সেবাকেন্দ্র মরিশাসের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। শতাধিক আশ্রিতের এই আশ্রয় স্থল দর্শকদের মনে সংবেদনা জাগায়। এই ট্রাস্ট একটা প্রাকৃতিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রও পরিচালনা করে।

সপ্তম দিনে কলাগাছে ঝুলে থাকা মোচা ও নষ্ট হতে থাকা কলা দেখে অমরদার ভিতরে লুকিয়ে থাকা কৃষকসত্তা জেগে ওঠে। রাস্তার ধারে উপেক্ষিত হয়ে থাকা মানকচু দেখে তার রান্নার প্রবৃত্তি উঁকি মারে। আমরা কয়েক দিনে যে ক'টা বাড়িতে গেছি তাদের প্রত্যেককেই অমরদা এসব শাকসবজি কীভাবে খাওয়া যেতে পারে ও স্বাদিষ্ট করা যেতে পারে তাই বুঝিয়েছেন, হাতেকলমে দেখিয়েও দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর দায়িত্বে থাকা 'কুটুম্ব প্রবোধন'-এর কাজও তিনি করেছেন। আমাদের বাসস্থানে রান্নাঘরে অমরদারই তত্ত্বাবধানে সমস্ত রান্না হলো। স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে একজন কার্যকর্তার রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছনোর প্রত্যক্ষ অনুভব সেই পরিবারে তিনি করে দেখিয়েছেন। সন্ধ্যায় সেই বিয়েবাড়িতে গিয়ে তাদের কাছে বিদায় নিলাম। রাত্রে এক বন্ধু তাঁর নতুন আরম্ভ করা রেস্টুরেন্টে খাওয়াবেন বলে আগ্রহ করে নিয়ে যান। সেখানেও অমরদার রুচি অনুসারে এই প্রবাসের প্রথম 'বাংলার খাওয়া'-র সুযোগ হলো।

গঙ্গা তালাও

আমরা যেহেতু আমার পাতানো বোনের বাড়িতেই আছি, তাই রাখিবন্ধন অগ্রিমই সেরে নেওয়ার কথা ভেবেছি। তাই অষ্টম দিনে আমরা কুন্তী বোনের হাত দিয়ে রাখি বেঁধে নিলাম। পরম্পরাগত উপহার ও মিষ্টান্নের আদানপ্রদান হলো। ভোজনের পর বিদায় নিয়ে রামায়ণ সেন্টারের হরিনাথজীর সঙ্গে রাজধানী পোর্ট লুইসের হিন্দু মহাসভার কার্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। ভারতীয় বংশোদ্ভূত দু'জন ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবকের সঙ্গে দেখা করে এলাম। মরিশাসের সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক অবস্থার বিষয়ে জানতে পারলাম। মরিশাসে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মসজিদের সংখ্যা, বাজারে বর্ধিত চীনের প্রভাব, বাংলাদেশিদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকারের শিক্ষা ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদাসীনতা এদের চিন্তিত করে ফেলেছে। তথাপি বর্তমান ভারত সরকারের প্রতি তাঁদের মনে আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।

রাজধানী পোর্ট লুইস থেকে সন্ধ্যায় চলে এলাম রামায়ণ সেন্টারে। সাত দিনের রামায়ণ পাঠের আজ শেষদিন। ব্যাসপীঠে পণ্ডিত রাজেন্দ্র অরুণ। প্রসঙ্গক্রমে জানাই যে পণ্ডিত রাজেন্দ্র অরুণ কলকাতার শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' প্রাপ্ত সমাজসেবী। ভজন মণ্ডলীর ভজনের শেষে আমাকে বলতে বলা হলো। আজ তুলসী জয়ন্তী, তাই তুলসীদাসের আসক্তি কীভাবে ভক্তিতে পরিণত হলো তারই ব্যাখ্যা করলাম। নির্মীয়মাণ রামমন্দির, বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকা বিবিধ প্রতিযোগিতা, ভাষণমালা ইত্যাদির দ্বারা রামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রামায়ণ সেন্টার করে চলেছে, তাদের সেজন্য ধন্যবাদ জানালাম। শেষে অরুণজীর সারগর্ভ ভাষণ হলো। সেন্টারেই আমাদের রাত্রি যাপন হলো।

নবম দিন আমাদের মরিশাস ভ্রমণের শেষ দিন। মরিশাসের ভূতপূর্ব সঙ্ঘচালক রঘুনাথ দয়াল কিডনির রোগে গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। হরিনাথজী নিয়ে যেতে রাজি হলেন। প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে জানলাম যে, সপ্তাহে তিন দিন তাঁর ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থাতেও তিনি তাঁর হিন্দুত্বের উপরে লেখা বই সম্পূর্ণ করবেন বলে সংকল্পবদ্ধ। এই আগ্রহ দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। দুঃখিত মনে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামায়ণ সেন্টারে ফিরে এলাম। অরুণজী, বিনুজী ও হরিনাথজী বিমানবন্দরে পৌঁছতে এলেন। রামমন্দিরের লোকার্পণ কার্যক্রমে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমরাও বিমানবন্দরে প্রবেশ করলাম। ব্যাগ জমা দিয়ে আমরা, বিমানে ওঠার আগে ভাবতে লাগলাম যে ৬৭ কিলোমিটার উত্তর দক্ষিণ ও ৪৩ কিলোমিটার পূর্ব পশ্চিম মানে ভারতের একটা ছোট জেলা। জনসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ অর্থাৎ ভারতের কোনো একটি শহর। অঙ্কে বুঝাতে গেলে ভারতের ৮০০ ভাগের এক ভাগ এই ক্ষুদ্র ভারত মরিশাস। আকার ছাড়া বাকি সব কিছুতে কিন্তু ভারত পিছিয়ে। এখানকার ১০০ টাকা পেতে হলে দিতে হবে ভারতের ১৯০ টাকা। সম্পন্নতা, সাংস্কৃতিক চেতনা, অনুশাসন, আতিথিপরায়ণতা, ধর্মীয় মনোভাব, স্বাভিমান, স্বাবলম্বন, শ্রদ্ধা-ভক্তি, সামাজিক সমরসতা ইত্যাদির তুলনা করলে মরিশাস এগিয়ে রয়েছে ভারতের চেয়ে দু' গুণ। তাই বিমানে ওঠার আগে ছোট ভারতকে প্রণাম জানিয়ে পাড়ি দিলাম বড়ো ভারতে। প্রণম্য মরিশাস— তোমায় প্রণাম। ■

নবাঙ্কুর

মহাবিশ্বে প্রাণ

ছাদের ওঠার নতুন সিঁড়ি হয়েছে পল্টুদের। সিঁড়ি বেয়ে সেদিন রাতে ছাদে উঠে দাঁড়াল পল্টু। কোমরে হাত দিয়ে মাথা হেলিয়ে তাকাল আকাশের দিকে। পরিষ্কার রাতের আকাশ। চাঁদ নেই বটে তবে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। সে সময়ে লোডশেডিং থাকায় তারায় ভরা আকাশটা যেন আরো ঝকঝক করছিল। কোন্ রাজা যেন মন্ত্রীকে আকাশের তারা গুনে সংখ্যা জানাতে বলেছিলেন। ঠিক মনে পড়ল না পল্টুর। কিন্তু ভুগোল স্যারের কথা স্পষ্ট মনে এল। একদিন পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন— দূরে, অনেক দূরে, কোনো নক্ষত্র কিংবা গ্রহে হয়তো লুকিয়ে আছে প্রাণ। আরো একবার ভালো করে তারাগুলোকে দেখার চেষ্টা করল পল্টু— ওদের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে সেই নক্ষত্র বা গ্রহ! কোন্‌টা? পুব কোণের ওই জ্বলজ্বল তারাটা, নাকি দক্ষিণে নিভু নিভু তারাটি? ওখানে যদি প্রাণ থাকে তবে তাদের কেমন দেখতে হবে? তাদের ক্লাস থ্রি-র ছেলেকে কি পল্টুর মতোই দেখতে? এমনই চেক কাটা জামা আর হাফপ্যান্ট? ভাবল পল্টু তেমন অবশ্য নাও হতে পারে। হয়তো ওদের স্কুলেই যেতে হয় না, পড়া না পারলে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না ক্লাসের বাইরে। ঘাড়টা ব্যথা করছিল পল্টুর, ভাবতেও আর ইচ্ছে করছিল না। ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের কথা তাই ওখানেই রেখে ছাদ থেকে নেমে এল সে।

ক্লান্ত, ছোট পল্টু থামাতেই পারে তার ভাবনা। কিন্তু সান্তাক্রুজ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ড্রেক থামতে জানেন না। সত্তর বছর পেরিয়ে গিয়েও অন্য গ্রহে প্রাণ খোঁজার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হননি। ১৯৫৯ সালে যখন লোকে অন্য গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর কথাকে গল্প বলে মনে করত, সে সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন ড্রেক। অন্যরা যাকে গল্প মনে করছিল সেই ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের বার্তা গ্রহণের কথা ভাবলেন তিনি। এজন্য সরকারের কাছে তিনি একটা বেতার দূরবীক্ষণ চেয়ে বসলেন। ভাবনাটা এরকম, ভিন্‌গ্রহের প্রাণীরা হয়তো বেতারতরঙ্গ পাঠাচ্ছে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। আমরা সেটা ধরতে পারছি না। বেতার দূরবীক্ষণে চেষ্টা করলে হয়তো সেটা ধরা পড়বে। এতো গেল ড্রেকের চেষ্টার একটা দিক। ১৯৭৪ সালে তিনি কী করলেন শোনা যাক্। 'ওজমা' প্রকল্পে, চব্বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের গ্রেট ক্লাস্টার অফ স্টারসের উদ্দেশে পৃথিবীবাসীর হয়ে সংকেত পাঠালেন, কী ছিল সংকেতে? কয়েকটা সহজ চিহ্ন দিয়ে অণুর কথা, বাইনারি গণনা পদ্ধতি, ডি. এন. এ, অণুর গঠন ইত্যাদি। মানে, মানুষ বিজ্ঞানের সবথেকে আধুনিক যে জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছে তার কথাই পাঠালেন তিনি। ধরেই নিয়েছিলেন, গ্রহান্তরের প্রাণীরা হবে বুদ্ধিমান, উন্নত। নাহলে তাদের পক্ষে এসব সংকেত বুঝে যোগাযোগ করাই অসম্ভব। এ ধরনের কাজ সাধারণ মানুষের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু এই পাগলামি চালানোর জন্যেই তৈরি হয় প্রোজেক্ট নাসা-সেট। তারিখটা ছিল ১৯৯২ সালের ১২ অক্টোবর, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশো বছর পূর্তির দিন।

তবে দুঃখের কথা, এখনও পর্যন্ত কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি যা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণ আছে। কিন্তু তাই বলে কি মেত্রোদোরাসের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে? খ্রিস্টপূর্ব চারশো সালের কাছাকাছি গ্রিক দার্শনিক মেত্রোদোরাস লিখেছিলেন এক বই, যার নাম 'প্রকৃতি বিষয়ে'। সেখানে তিনি বলেন, বিশাল প্রান্তরে কেবল একটি গমের শীষ খুঁজে পাওয়া এবং এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে একটিমাত্র গ্রহে প্রাণ খুঁজে পাওয়া—দুই-ই অস্বাভাবিক। তাঁর কথা যদি মানতে হয় তাহলে বলতেই হবে পৃথিবী ছাড়াও প্রাণ রয়েছে অন্য গ্রহে।

সংগৃহীত— এই পৃথিবীর যত রহস্য—মানসপ্রতিম দাস।

রাজ্য পরিচিতি

তেলেঙ্গানা

ভারতের সদ্য গঠিত রাজ্য তেলেঙ্গানা। অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ হয়ে ২০১৪ সালে পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হায়দরাবাদ শহর অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার যৌথ রাজধানী। তেলেঙ্গানা নামটি এসেছে 'ত্রিলিঙ্গ দেশ' কথাটি থেকে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলটি নিজাম শাসিত দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের অংশ ছিল।

এই রাজ্যের প্রধান দুটি নদী কৃষ্ণা ও গোদাবরী। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি হলো কাকতীয় তোরণ, কাকতীয় রাজবংশের রাজাদের দ্বারা নির্মিত রামাপ্পা মন্দির, নিজামদের বাসভবন চৌমাহাল্লা রাজপ্রসাদ ইত্যাদি। এখানকার প্রধান ভাষা তেলুগু। ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তেলেঙ্গানার মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৪০ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৫৭ জন।

এসো সংস্কৃত শিখি

যথা ভবান্ ইচ্ছতি তথা

যা আপনি চাইছেন তাই।

ভবতু, চিন্তাং ন করোতু।

ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না।

তেন কিমপি ন সিদ্ধ্যতি।

ওতে কিছু হয় না।

সঃ সর্বথা অপ্রযোজকঃ।

সে নেহাতই অযোগ্য।

প্রযোজনম্ এব নাস্তি।

দরকার-ই নাই।

ভালো কথা

পাহাড় ভ্রমণ

দুর্গাপুজোর সময় আমরা মানালি ঘুরে এলাম। হাওড়া-রাজধানী ধরে দিল্লী, সেখান থেকে মানালি। প্রথমে হিড়িম্বামাতার মন্দির দর্শন করলাম। আমি সেখানে ইয়াকের পিঠে চড়ে ছবি তুলেছি। পরের দিন সকালে গাড়ি করে রোটাং পাস। রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হল প্যারা- গ্লাইডিং। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রচুর বরফ পেয়েছিলাম। সেখান থেকে রওনা হলাম জিরো পয়েন্টের উদ্দেশে। রাস্তার দু'ধারে স্তূপীকৃত বরফ। হাত পা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল। হাতে বরফ নিয়ে দিদি আর আমি ছোড়াছুড়ি করতে লাগলাম। ফেরার সময় কুন্তীমাতার মন্দির দর্শন করার জন্য গাড়ি দাঁড় করানো হলো, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য দু'মিনিট থেকেই হোটেলে ফেরার জন্য রওনা দিতে হলো।

অর্ঘ্যদীপ আঢ্য, তৃতীয় শ্রেণী, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

পাঠশালা

অনুভব বেরা, তৃতীয় শ্রেণী

আমার অনেক বন্ধু আছে
থাকি সবাই মিলেমিশে
দাদাভাই-দিদিভাইরা
আমাদেরকে ভালোবাসে।

আদর করে পড়ায় তাঁরা
দোষ করলে শুধুই বকা
আনন্দেতে ভরে থাকে
আমাদের এই পাঠশালা।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

কালোটাকার সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের আর্থিক স্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে চলেছে। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও কালোটাকায় দেশ ছেয়ে গেছে। অনেকেই এই নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা আলোচনা করেন কীভাবে এই দুরারোগ্য অর্থনৈতিক ব্যাধি ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে চলেছে। বড় বড় নেতারা ভোটের সময় কতই না কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে থাকেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর যেই ভোট হয়ে যায়, আবার সব চুপচাপ। কিন্তু এবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভ্রষ্টাচার, কালোটাকা বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। ৮ নভেম্বরে তিনি ঘোষণা করে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে দিলেন। জনসাধারণের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য নোট বদলে নেবার জন্য ৫০ দিন সময় দিলেন। কোনোরকম অগ্রিম সূচনা ছাড়াই তিনি এই ঘোষণা করেন। এতে মুশকিলে পড়েছে এতদিন ধরে কালোটাকায় বিলাস-ব্যসন করে আসা মানুষেরা। এদের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতাও আছেন, তাঁরা নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। সাধারণ মানুষ সব থেকে বেশি বিব্রত হয়েছেন, অথচ তাঁরাই প্রধানমন্ত্রীর এই দৃঢ় পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন।

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ছিল— 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান'। ভ্রষ্টাচার আর কালোটাকার প্রভাবে পরবর্তীকালে কিছু মানুষের চাহিদা বাড়তে শুরু করে। সেই টাকা দিয়ে তারা নামি-দামি কোম্পানির খাবার, জামাকাপড় এবং প্রাসাদোপম একাধিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে চলেছে। অথচ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তেরা টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ায় সীমিত উপার্জনে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। বর্তমানে একশ্রেণীর লোকের কাছে একাধিক নামি-দামি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, নোটবুক, বাইক, গাড়ি, বাড়ি; অপর শ্রেণীর কাছে সীমিত আয়ের সীমিত উপকরণ। পড়াশুনাও ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যেতে বসেছে। প্রাইভেট বিদ্যালয়, কোচিং, উচ্চশিক্ষা দিনে দিনে মহার্ঘ্য হয়ে চলেছে। তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। আমরা সবাই অন্যের দেখাদেখি বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে জীবন কাটাতে চাই। তার জন্য আর এক দল কালোবাজারি ইএমআই-এর ফাঁদে আমাদের ফেলছে। আর আমরাও চোখ বুজে ঋণ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। অথচ ভারতীয় চিন্তাধারায় দৈনিক জীবনযাত্রায় ঋণ নেবার প্রশ্নই ওঠে না, বরং আয়ের একটি অংশ সঞ্চয়ের কথা বলা হয়েছে (পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদের ওপর আর্থিক বিকাশ)। এই পরিস্থিতিতে সীমিত উপার্জনে সংসার চালানো মহিলাদের জন্য যেমন কঠিন তেমনি নিজেকে এবং পরিবারকে ঠিক রেখে সবার চাহিদা সীমিত করাও একটা কঠিন কাজ। সব জিনিসের দাম বাড়ছে। গৃহিণীদের পক্ষে সংসার খরচ করার পর খুবই সামান্য সঞ্চয় থাকে, যা দিয়ে বিলাসিতা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এই বৈষমতায় বর্তমান মানুষ নানাভাবে বিব্রত। ভারসাম্যহীনতার সাধারণ প্রভাব পরিবার, সমাজ এবং দেশে ব্যাপকভাবে পড়ছে। অন্যের দেখাদেখি ঋণ করে হলেও কালোটাকাওয়ালাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরা শুধু আমাদেরই নয়, পরবর্তী প্রজন্মেরও ক্ষতি করে চলেছি। অনেক মা-বাবা, এমনকী ছোটরাও ওই শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছে। সোশ্যাল সাইটগুলোও পাল্লা দিয়ে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চলেছে। এইভাবে নতুন প্রজন্ম আরও বেশি করে নানান জিনিস কিনে চলেছে— প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কোনো ব্যাপার নেই। চাহিদাপূরণ না হলে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির রাস্তা নিতেও তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। ভ্রষ্টাচার আর কালোটাকার দান হলো দুর্বল ব্যক্তি, দুর্বল পরিবার, দুর্বল সমাজ এবং দুর্বল দেশ। একদিকে চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসন, অপরদিকে পর্যাপ্ত খাবার জোটে না। প্রয়োজনীয় জামাকাপড় নেই আর নিজস্ব বাসস্থান তো অলীক স্বপ্ন! একদিকে অন্তহীন চাহিদা, অপরদিকে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু জুটছে না— এই অর্থনৈতিক বিভেদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী কালোটাকা। আমরা যারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের মঙ্গল কামনা করি, তারা কেউই কালোটাকাকে মেনে নিতে পারিনি, পারছি না আর পারবও না। গৃহিণীরা সাধারণত মা-লক্ষ্মীর নামে ঘরেই কিছু সঞ্চয় করে থাকেন। সেই সঞ্চয় প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে পরিবার ও সমাজের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হয়। এই টাকার সঠিক হিসাব হয়তো দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটি পরিস্থিতি সাপেক্ষ। এই ঘরোয়া সঞ্চয় যাতে কালোটাকায় পর্যবসিত না হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘরোয়া সঞ্চয়কে মান্যতা দিয়েছেন। এতে ওই সুদুদ্দেশ্যের অর্থ তাঁরা নিশ্চিন্তে বদলে নিতে পারেন। মহিলাদের এই সঞ্চয়ের প্রতি সুবিচার করেছেন বলে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আজ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন একটি সাহসী, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ কালোটাকার মালিকরা আজ বিপন্ন। এর জন্য আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে, তবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই অসুবিধা মেনে নেওয়া যায়। কালোটাকার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি রইল দেশবাসী তথা মহিলাদের অভিনন্দন! ■

অতিথি কলম

অমৃত ধীলন

তথাকথিত উদারবাদীদের অবরুদ্ধ মন

উদারবাদীরা সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত। তাদের কাছে সব পথই বদ্ধ জলাশয়মুখী। যেদিন থেকে নরেন্দ্র মোদী দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন সেইদিন থেকেই তাঁরা গালমন্দ শুরু করেছেন। দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যে-কোনো কাজকর্মে কোনো ভুল বা অসামঞ্জস্য নজরে পড়লেই তাঁরা এর জন্য নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করছেন। মোদীর বক্তব্যের আক্রমণাত্মক ঢঙকে নিজেদের মতো বাড়িয়ে বলতে গিয়ে অযথা মিথ্যে অভিযোগের মোড়কে চাউর করে তারা আদতে দেশে সৃষ্টির সেই সুচনালগ্নে পৃথিবী যেমন এক আদিম চটচটে কাদার আবরণে লেপটে ছিল ঠিক তেমনই এক গা ঘিনঘিন পরিবেশ তৈরি করছেন।

প্রত্যেকটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে তাঁরা মোদীর দরজায় নিয়ে গিয়ে ফেলছেন। কয়েকটা উদাহরণ প্রয়োজন— মহম্মদ আখলাকের বিতর্কিত খুন, ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা, কাশ্মীরে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জঙ্গি কার্যকলাপ, যুক্তিবাদী কলবর্গীর হত্যাকাণ্ড, তাঁর দলিতের ওপর চাবুক চালানো, জেএনইউ-এর ছাত্র রাজীবের নিরুদ্দেশ হওয়া থেকে রাহুল গান্ধীর Twitter A/c হ্যাক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব রকমের কার্যকলাপের জন্যই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নরেন্দ্র মোদী। এতগুলো বিচিত্র চরিত্রের ঘটনার মধ্যে উদারবাদীরা একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছেন তা হলো বিজেপি-র হিন্দু জাতীয়তাবাদের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা, কয়েক যুগ ধরে চলে আসা কাশ্মীরের রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসা তো মোদীর বহু আগে থেকে ঘটে চলেছে যা সম্প্রতি ভয়ঙ্কর-জঙ্গি বুরহান ওয়ানির সংঘর্ষে মৃত্যুর পর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জন্য মোদী দায়ী হবেন কী করে? কী করেই বা এই ঘটনার সঙ্গে আখলাককে পিটিয়ে মারার যোগসূত্র থাকতে পারে। এরকম আধা উন্মাদ আচরণ করার অর্থই নিজের যুক্তিকে হারিয়ে ফেলা। টানা দু'বছর ধরে উদারবাদীরা অক্লান্তভাবে মোদীর দিকে কাদা ছুঁড়ে চলেছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন কিছুটা চটচটে কাদা অন্তত তাঁর গায়ে আটকে থাকবে। কিন্তু হায়! নিরন্তর অবান্তর হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে তাদের আস্ফালন আজ শূন্যগর্ভ আর বিশ্বাসযোগ্যতাটাই ধ্বংসের মুখে।

“টানা দু'বছর ধরে উদারবাদীরা অক্লান্তভাবে মোদীর দিকে কাদা ছুঁড়ে চলেছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন কিছুটা চটচটে কাদা অন্তত তাঁর গায়ে আটকে থাকবে। কিন্তু হায়! নিরন্তর অবান্তর হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে তাদের আস্ফালন আজ শূন্যগর্ভ আর বিশ্বাসযোগ্যতাটাই ধ্বংসের মুখে।”

আবার এর মধ্যে সবচেয়ে অসংযত অভিযোগ মোদী একজন ফ্যাসিস্ট। Facism-এর জন্ম সকলেই জানেন বিংশ শতাব্দী ১৯২০ সাল বরাবর, তার সঙ্গে ২০১৬ সালের ভারতের কোনো কষ্ট কল্পনাও এঁটে উঠতে পারবে না। এঁদের বুদ্ধিবৃত্তির দৌড় কতখানি নীচু স্তরে নামলে তবেই এত বিশাল একটি দেশের জনগণের দ্বারা বিপুল ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দেওয়া যায়। এঁরা একবারও ভাবেন না যে তৎকালীন ইতালির শাসনব্যবস্থার পররাজ্য আক্রমণের লিপ্সা, শ্বেতকায় ইউরোপিয়ানদের অন্য জাতিগোষ্ঠীর থেকে শ্রেষ্ঠত্বের জাত্যাভিমান, সর্বোপরি একচ্ছত্রবাদী একটি শাসন প্রতিষ্ঠার অভিলাষের সঙ্গে আজকের ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সারা বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ের কোনো তুলনাই হতে পারে না। সেগুলি সবই অক্ষমের আস্ফালন ছাড়া কিছু নয়।

এই সূত্রে সীতারাম ইয়েচুরি যখন মোদী সরকারকে অকাতরে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে বসলেন তখন সিপিএম-এর পূর্বতন সম্পাদক তাঁর বক্তব্য নস্যাৎ করে বলেন, এই সরকারকে কোনোভাবেই ফ্যাসিস্ট বলা

চলে না তবে 'একনায়কতন্ত্রমুখী' বলা যেতে পারে। একথায় তথাকথিত কুৎসাপ্রিয় উদারবাদীদের আঁতে ঘা লেগে যায়। এই প্রসঙ্গে নিজেদের অসহিষ্ণুতা ধরে রাখতে না পেরে হঠাৎ নেতা সিপিআই-এর কানহাইয়া কুমার কারাতকে কুৎসিত আক্রমণ করে বলেন, 'যে সিপিএম নেতা মোদী সরকারকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিতে পারছেন না তার ময়দান ছেড়ে পালিয়ে নিউইয়র্কে চলে যাওয়া উচিত।' কুমারের এই আপাত পারম্পর্যহীন আক্রোশপ্রসূত কথাবার্তা উদারবাদী শ্রেণীর মানসিক দেউলেপনার সেরা উদাহরণ। তাদের চিন্তাস্রোতটি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। মনের দরজায় ডবল তালা পড়ে গেছে। সমস্ত জানলায় কঠিনভাবে শাটার টানা যাতে কোনো দিক থেকে কোনো বিরুদ্ধ মত না অনুপ্রবেশ করতে পারে।

আবার দেখুন, রাহুল গান্ধীর টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যেতে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বললেন, 'এতো সরকারেরই কাজ। এটিই ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতি'।

এর পরও রয়েছে সাম্প্রতিক নোটবন্দিকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের যে অসুবিধের মধ্যে যেতে হচ্ছে, দেশে যে অর্থনৈতিক অসন্তোষ রয়েছে সে সম্পর্কে প্রবীণ বামপন্থী সাংবাদিক সুশীল আরওন বিশ্লেষণ করে বললেন ১৯৬৬-৭৬-এর দশকে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছিল এই নোট বাতিল কাণ্ড তারই শামিল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে তা ছিল চীনের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী, ভ্রাতৃঘাতী দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ। চীনের সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব অধ্যায়ের কালো পর্বে বহুলক্ষ মানুষ কারাবন্দি হয়েছিলেন। মারা গিয়েছিলেন আরও কয়েক লক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বহুমূল্য সাংস্কৃতিক স্মারকসমূহ গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমাজ ব্যবস্থাকে ওপর থেকে নীচে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত রকমের প্রতিবাদের সহিংস কণ্ঠরোধ করা হয়। দৈহিক অত্যাচারকে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি আবশ্যিক অস্ত্রে পরিণত করা হয়। হায়! এই বিকৃত মস্তিষ্ক স্বার্থোন্মাদ উদারবাদীরা সেই নৃশংসতার সঙ্গে আজকের এই অর্থনৈতিক সরকারি সিদ্ধান্তের তুলনা টেনে ফেললেন।

প্রত্যেকটি সরকারি কার্যকলাপের কু-মতলব আবিষ্কার করার প্রবণতায়, সরকারের তরফে কোনো ভাবনায় ত্রুটি থাকলে নিজেদের পক্ষে ততোধিক অবিশ্বাস্য কিছু প্রচার করার তাগিদে সরকারের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টা করছেন। তাঁরা কোনো ঘটনার লঘুগুরু তফাত করার চেষ্টা না করে শুধু ঘৃণ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন। এর ফলে তাঁরা জনগণের প্রবল ক্ষতিসাধনে লিপ্ত। তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন যে, তাঁরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একজন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানকে ফ্যাসিস্ট বলে দেওয়ার পর যদি ভবিষ্যতে দেখা যায় তিনি তাঁদের আরও অপছন্দের কোনো কাজ করে ফেলেছেন তখন কী আর তকমা দেওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকবে? আসলে সদা চিৎকৃত, গোঁড়া ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারের পরিণতিতে তথাকথিত উদারবাদীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত চরিত্র লক্ষণগুলি হারিয়ে ফেলছে।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় তাঁরা যদি এই প্রক্রিয়া অবিরাম চালিয়ে যেতে থাকেন তাহলে অচিরেই তাঁদের এই চিৎকার পারিপার্শ্বিক কোলাহল বলে প্রতিপন্ন হবে যা অনায়াসেই অবজ্ঞা করা যায়। এমন ক্রমিক একঘেয়ে আক্রমণের ফলে সরকার হয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে এবং আরও অনেক কিছু করার কথাই ভাবতে পারে, কেননা তাদের তো সরকারকে চলমান রাখতে হবে।

এরকম নেতিবাচক প্রবণতা—আমি যা ভাবছি কেবল সেটাই ঠিক, অন্য মতের কোনো দাম নেই, সব কিছুতেই আমার উত্তরটাই সঠিক— ভারতীয় উদারবাদীদের এই গোঁড়ামি কিছুকাল আগেই মার্কিন উদারবাদীদের মধ্যেও নজরে এসেছিল। সেখানকার উদারবাদীরা লক্ষ লক্ষ আম-মার্কিনীদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অসাড় ছিলেন যে তাঁরা ভাবতেই পারেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষমেষ জিতে আসবেন। ইংল্যান্ডের উদারবাদীরাও যুগ যুগ ধরে ইংল্যান্ডবাদীকে মিশ্র সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হতে বলেছিল। আম বিলেতবাসী কিন্তু Brexit করে— ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার পক্ষে মত দিল।

একটি উদারবাদী বিলিতি সংবাদপত্র Guardian-এর নাম এ প্রসঙ্গে করতেই হবে। পত্রিকাটি একটি ধ্রুপদী আবদ্ধ-উদারবাদী ছলনার চরম উদাহরণ রেখেছে। কাগজে মোদী সরকারের গঠনমূলক ভাবনা চিন্তা নিয়ে কখনও কোনো খবর প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু কাশ্মীরের ওপর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে— 'কাশ্মীরের ওপর ভারতের দমনমূলক ব্যবস্থা জারি হলো। সেখানে কি পৃথিবীর প্রথম গণ-অন্ধত্বকরণের সূচনা করা হয়েছে?' প্রসঙ্গটি ছিল সেনাবাহিনীর রবার বুলেটে জনৈক তরুণের চোখের ওপর অনিচ্ছাকৃত আঘাত। কিন্তু একথা জানতে কৌতূহল হয় যে সম্পাদক কি কখনও সেখানকার বিদ্রোহী যুবকদের ইসলামিক স্টেটের পতাকা ওড়ানোর খবর তাঁর কাগজে ছাপার হিম্মত রাখেন। হ্যাঁ, গণ অন্ধত্বকরণের গল্প ছাপলে কিন্তু কাশ্মীরে চলা তীব্র রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আরও বহু মতামতও ছাপতে হবে।

মনে পড়ে বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী 'মাঞ্চ'-এর একটি বিশ্বখ্যাত ছবির কথা। ছবিটির নাম হলো— 'The Scream (আতঙ্ক)'। আরে মোদী সরকার এসে গেছে, 'ও! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, ভয়ঙ্কর কাণ্ড'। ছবিটিতে তিনটি মেয়ে একটি বিশেষ কিছু দেখে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ভয়ে চেঁচাতেই থাকে— 'ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর'। এখানেও ঠিক তাই। মনের অবচেতনের ভাবনা উদারবাদের নাম করে সামাজিক পরিবেশ দূষিত করছে। সত্যিই যদি তারা চিরকালীন উদারবাদী ভাবনাকে মর্যাদা দিতে চান তাহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে লোক জড়ো করার বদলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।

(লেখক একজন সাংবাদিক)

দিদির যে সব দিতে হবে

অভিমন্যু গুহ

রবি ঠাকুরের গানটা এককালে দিদির খুব প্রিয় ছিল। বিশেষ করে ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটে বিপুল সাফল্যের পর তিনি নাকি যত্রতত্র এই গানটি পরিবেশন করতেন— 'আমার যে সব দিতে হবে। সে তো আমি জানি। আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।' বাণী তাঁকে দিতে হবে, এ জানা এমন কী আর কঠিন কাজ! অকাতরে যেখানে-সেখানে অপাত্রে-কুপাত্রে অজস্র বাণী তো তিনি বিলিয়েছেনই। সে বাণীর এমনই জোশ যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ অবধি ফেল মেরে বসে আছেন। বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখুন রামকৃষ্ণের কথামৃত আর দিদির কথাঞ্জলির মধ্যে কোনটির কাটতি বেশি! রামকৃষ্ণদেব এক্ষেত্রে দিদির ধারে কাছে আসবেন বলে মনে হয় না। সুতরাং বাণীদায়িনী দিদির রবি ঠাকুরের 'আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী' গানটি পছন্দ হবে না তো কার হবে? কিন্তু তাই বলে বিত্ত! দিদি হলেন গিয়ে বিত্তশূন্য। তবে নিজের সততাকে কীভাবে জাহির করতে হয় কিংবা চিল চিৎকারে পাঁচ-পাবলিকের কর্ণগোচর করতে হয় সেটা দিদি আর তাঁর ভাইদের না দেখলে বোঝার উপায় নেই। সে সারদা আর নারদা কাণ্ডে যতই তাঁদের বেলুন চুপসোক। কিন্তু বিত্ত দিতে হবে এ আবার কেমনতরো বাণী? গানে অমন অনেক কিছু লিখতে হয়। সে হলো গিয়ে কাব্য। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে বাস্তবকে মেলালে চলে বলুন!

বাণী যত চাস সে না হয় দিদি দিয়ে দেবে রে বাপু! কিন্তু বিত্তশূন্য দিদির কাছে বিত্ত চাস কোন আবদারে? বলুন দেখি পাঁচশো আর হাজার টাকার নোটগুলোকে অচল আধুলি করে দেওয়ায় দিদির কী মুশকিলটাই না হলো! প্রথমত, তিনি তো ধারে পুজো দেওয়ার মিষ্টি কিনলেন। এতে অবশ্য দু'টো জিনিস বোঝা গেল। একনম্বর, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঋণ আছে বলে চেঁচামেচি করার কোনো মানে হয় না। চৌত্রিশ প্লাস ছয় বছরে ধার আমাদের জাতিগত পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। দিদিরটা তো প্রতীকী মাত্র। তবে এরাজ্যের যাবতীয় ধার মকুব করে দেওয়ার জন্য তিনি যেমনটি আবেদন জানান কেন্দ্রের কাছে, যদিও সে আবেদনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করেনি, কিন্তু এক্ষেত্রে তুচ্ছ মিষ্টিওয়ালা কেন্দ্রের শরিক হবে; তার ঘাড়ে কি লক্ষ লক্ষ মাথা আছে? এ তো গেল সামান্য একশো টাকার মামলা। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে খুঁজলেও এই ধার ধরা পড়বে না। দিদির ভাইয়েরা এমনতরো কত ধার করে রেখেছেন গত ছ'বছর ধরে এবং আরও কত রাখবেন, সব কি শুধতে হবে নাকি? সবাই তো আর মোদী সরকারের মতো সাম্প্রদায়িক নয়। রাজ্যটাকে সার্বিকভাবে চিরঋণী করে রাখার এই ধনুকভাঙা পণে দিদি আর তাঁর শাগরেদ ভাইয়েরা আসবে না তো কি স্বয়ংসেবকরা আসবে?

তবে দিদির ভাইদের চারিত্রিক বদলটা খেয়াল করেছেন কি? একা সেকুতে রক্ষে নেই, মাকুরাও এবার দিদির দলে যোগ দিয়েছে। বিধিবদ্ধ ও ভারতীয় গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় লালিত মাকুরা প্রকাশ্যে যতই দিদির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখুক না কেন দিদির তাতে বয়ে গেছে। নির্বাচনগুলোতে এদের যা ফলের ছিরি তাতে রাস্তার ভিখিরিও আর এদের পাত্তা দেবে বলে মনে হয় না। দিদির ঢের আস্থা বরং খ্যাকশ্যালি মাকুদের প্রতি। এই খ্যাঁকশ্যালিরা গণতন্ত্র-টনতন্ত্রের ধার ধারে না। চীনের চেয়ারম্যানই এদের চেয়ারম্যান। বন্দুকের নলই এদের শক্তির উৎস। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এদের চোখে বুর্জোয়া। সংসদ ভবনটা স্রেফ শুয়োরের খোঁয়াড় বইতো কিছু নয়। এই ডেয়ার ডেভিল ভাইদের দিদির ভারী পছন্দ। আর এই খ্যাঁকশ্যালি মাকু ভাইয়েরাও বুঝে গিয়েছে যে দিদি বিনে তাদের গতি নেই।

এই খ্যাঁকশ্যালিদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলার রয়েছে। এরা সুযোগ মতো গণতান্ত্রিক কাঠামোয় থাকা মাকুদের আশ্রয় করে। কিছুদিন আগেই জে এন ইউ বা যাদবপুরে এই নমুনা দেখা গিয়েছে। জে এন ইউ-র কানাকুমার ছিল একটি নিষিদ্ধ খ্যাঁকশ্যালির লিডার। পিঠ বাঁচাতে এ রাজ্যে মাইক্রোস্কোপিক সাবেক মাকু

পার্টির ছাত্র সংগঠনে নাম লিখিয়েছিল। এ রাজ্যে গত বিধানসভাতেও এই খ্যাকশ্যালিদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নামতে দেখা গিয়েছিল। তবে বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে মাকু পার্টির হালত দেখে তারা বুঝে গিয়েছে এদের সঙ্গে থাকলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার থেকে দিদি ভালো। আর খ্যাঁকশ্যালিরা এও জানে দিদিকে দিয়ে তাদের অ্যাজেন্ডা যত তাড়াতাড়ি ফুলফিল হবে, এই অস্তাচলে যাওয়া মাকুদের দিয়ে তার কানাকড়িও হবে না। যেমন ধরুন ভারতীয় সেনার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা। দিদি যা খেল দেখাচ্ছেন, তাতে খ্যাঁকশ্যালিদের কাছ থেকে তিনি মাও জে দঙ্‌ বা ফিদেল কাস্ত্রো সম্মানে ভূষিতা হলেও কারুর বলার কিছু থাকবে না।

তারপর ধরুন জঙ্গিদের প্রতি তাঁর দরদ। যে দরদের অজস্র নমুনা খাগড়াগড় থেকে কালিয়াচক অবধি ছড়িয়ে রয়েছে। খ্যাঁকশ্যালিরা অচিরেই তাকে 'নেত্রী' বলে মেনে নিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। আর একথাও তো ভুললে চলবে না, পরে তিনি যতই কিষেনজী-টিশেনজীকে হাপিস করুন এই ম্যাওগুলো না থাকলে আর খাগড়াগড় কালিয়াচক থেকে মিঁয়াও মিঁয়াও ডাক শোনা না গেলে পশ্চিমবঙ্গে মসনদে তাঁর আর বসা হোত না। মাকুরা তো শুধু মুসলমান তোষণের পথ দেখিয়েছিল আর এককালে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান তুলে পাকিস্তান আর চীনের দলালি করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান তোষণকে যে কী অসাধারণ কৌশলে জঙ্গিয়ানায় রূপান্তরিত করা যায় সে থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালের মাথায় রাখবে না তো কী ওই ম্যাদামারা মাকুগুলোকে মাথায় তুলে নাচবে।

খ্যাঁকশ্যালিদের মোটেও খাটো করা উচিত নয়। হুঁ হুঁ বাবা তাদের মুখপত্র হিসেবে এখন ভজানন্দ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের বৈদ্যুতিন মুখপত্র আবাপ ভজানন্দ আর ছাপানো মুখপত্র ভজানন্দবাজার পত্রিকা। এর মধ্যে আবাপ ভজানন্দের ক্ষেত্রে সুবিধে হলো এদের নেতা দুশমনবাবু অনেকটা তরল পদার্থের মতো, যখন যে মালদার পাত্রে রাখবেন তখন তিনি সেই পাত্রের আকারেই অবস্থান করবেন। তবে ইনি আপাতত ভজানন্দবাজারের বর্তমান হর্তাকর্তা শনির্বানের অধীন। আর শনির্বান হলো গিয়ে খ্যাঁকশ্যালিদের পালের গোদা। এদের কিছু পোষা হুক্কা হুয়া আছে। যাদের কাজ সন্ধ্যেবেলা পাউডার সেন্ট-টেন্ট মেখে স্টুডিয়োয় জড়ো হয়ে মোদীর পিণ্ডি চটকানো আর নইলে ভজানন্দবাজারের পোস্ট এডিটোরিয়াল পাতায় প্রধানমন্ত্রীর বাপ-বাপান্ত করা। কিন্তু তাঁদের এটুকু বোঝারও ক্ষ্যামতা নেই যে এদের এন্তেকাল উপস্থিত। কোন চুলোয় আর গতি হবে, বেহেস্তেই যাবে হয়তো। তার আগে পাপের ভাঁড়ার যতটা পারা যায় পূর্ণ করে নেওয়া। এদের চোখে সেনা-হত্যাকারী জঙ্গিদের মানবাধিকার রয়েছে, বাক্‌-স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু জঙ্গিদের এনকাউন্টারে মারলে এদেশের সেনাবাহিনী বা পুলিশ হয়ে যায় এদের চক্ষুশূল। ফলে এরা যে দিদির উপযুক্ত ভাই সে ব্যাপারে খ্যাঁকশ্যালি আর দিদি উভয়েই নিশ্চয়ই সহমত হবে। তাই সরকার-ত্যাগী ভজানন্দ গোষ্ঠী দিদি ভজনা তো করবেই, মানে করতে বাধ্য আর কী! রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা উপভোগ করে রাষ্ট্রের বিরোধিতাটা ভালই হয় কিনা। এরা যতদিন আছে, ততদিন আর কিছুর না হোক, চীন-পাকিস্তানের খোচরের অভাবটুকু অন্তত হবে না।

কথায় কথায় অনেক দূর আসা হয়ে গেছে। পুজো দেওয়ার জন্য দিদি মিষ্টি কেনায় দ্বিতীয় যে জিনিসটা বোঝা গেল যে সেকু দিদি তবে পুজো দেন! আসলে মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি একটু বেশিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কিনা তাই অমন কথা বলে ফেলেছেন। মনে যাই থাকুক মাথা ঠাণ্ডা থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর এ জাতীয় কথায় মুসলমান ভাই ও সদ্য ভ্রাতৃত্ব বরণ করে নেওয়া খ্যাঁকশ্যালিরা কতটা চটবেন। আর সেকুদিদি যেখানে দুর্গাপুজোকে স্রেফ উৎসবের বাইরে আর কিছু ভাবতেই পারেন না কিংবা এর শুভেচ্ছা জানাতে ঈদকে লেজুড় জোড়েন, তাঁর মুখে কি পুজো দেওয়ার জন্য মিষ্টি কেনার কথাটা মানায়? উত্তেজনায় অসাবধানতা বশেও কি মানায়? তিনি পীরের দরগায় মানত করার জন্যও তো একশো টাকা ধার চাইতে পারতেন কিংবা ইমামকে প্রণামী দেওয়ার জন্য, তাহলে তো অন্তত মোদীকে ঠেসে ধরতে আরেকটু কমিউনাল গেম খেলার একটা চান্স পাওয়া যেত!

কিন্তু এই যে সেটা গেল না, এর জন্য কি দিদি দায়ী, নাকি তার পার্ষদরা? পার্ষদগুলোর কথা ছাড়ুন। ওগুলোর মাথা ও পেট প্রোপোরশানেটলি মোটা। এর জন্য দায়ী ভজানন্দ গোষ্ঠী। ওরে তোদের পেজগুলো কি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলার জন্যই আছে? ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাসিমুখের ছবি দিয়ে রক্ত জল করা ভারতীয় নাগরিকদের করের টাকাগুলোও নিবি আর তার পাশেই দিদির বাণী ছাপবি— 'ভারতীয় সেনাবাহিনী হটাও, দেশ বাঁচাও' কিংবা 'চীন পাকিস্তান লাও, দেশ বাঁচাও'। ওরে একথা কী আর তোদের শেখাতে হবে 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান', কিংবা 'ভুলতে পারি বাপের নাম, ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম'। মোদীকে কি এদেশের প্রধানমন্ত্রী বলে ভাবিস কিংবা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ? অগত্যা ভজানন্দ গোষ্ঠীর আকুতি 'দিদির তীর্থে (কালীঘাটে) তব, এবার শরণ লব।'

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : লেখার সঙ্গে বাস্তবের মিল নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়। ■

তিন তালাক প্রথার অবসান চায় আরশিয়া

মাধবী মুখার্জী

তিন তালাক প্রথা অর্থাৎ তিন বার তালাক উচ্চারণ করে মুসলমানদের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়ার প্রথা। এই প্রথা বাতিলের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী তরুণী আরশিয়া। মাত্র ১৬ বছর বয়সে আরশিয়ার বিয়ে হয় মহম্মদ কাজিম নামে এক ধনী সবজি বিক্রেতার সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের দু' বছরের মধ্যে একটি কাগজে তিনবার তালাক লিখে আরশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের

পরিসমাপ্তি ঘটায় কাজিম। ওই কাগজে কাজিম লিখে জানায় যে তার হৃদয়ে আরশিয়ার কোনো স্থান নেই। এমনকী আট মাসের কোলের সন্তান-সহ আরশিয়ার বাড়িতে থাকবারও কোনো অধিকার নেই।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরশিয়া জানায়, ‘‘আমার মতো নারীদের সাহায্য করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই এবং অসংখ্য নারীর জীবন ধ্বংসকারী তিন তালাক প্রথা বাতিলের দাবি জানাই।’’ আরশিয়ার মতে এই প্রথা প্রজন্ম ধরে মুসলমান নারীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আরশিয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিন তালাক প্রথার নাগপাশে জর্জরিত হয়েও প্রতিক্রিয়াশীল এমন সমাজকে বহু মহিলা ধিক্কার জানিয়েছেন। যাঁরা তিন তালাকের মতো জঘন্য প্রথার অবসান চান, তারাও এগিয়ে আসুন। মনে প্রাণে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। মতামত প্রকাশ করুন।

তিন তালাক নামক ব্যাধিটি মুসলমান নারী সমাজে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে যে একক বা অসংলগ্ন প্রচেষ্টায় এ রোগ সারনো সম্ভব নয়। তিন তালাক প্রথা রদের দাবিতে মুসলমান মহিলাদের সংগঠনের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে করা সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ল' কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান জানতে চাওয়ায় আইন মন্ত্রক জানায় যে, তিন তালাক পদ্ধতি দেশের সংবিধান বিরুদ্ধ। ল' কমিশন সহমত পোষণ করার পর দেশজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিন্তার অগ্রগতির যুগে যেখানে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি শুধু উচ্চারিত নয়, সেখানে মুসলমানদের সামাজিক ও আইনগত ভাবে স্বীকৃত ইচ্ছেমত যখন তখন স্ত্রীকে তিন তালাক বলে তাড়িয়ে দেবার অধিকার থাকা উচিত কিনা তা নিয়ে সঠিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এবং সেটা নিয়ে বিতর্ক হওয়া সুস্থ ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। স্বাভাবিকভাবেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলমান মৌলবাদীরা ‘গেল গেল’ রব তুলে ইসলাম বাঁচানোর নামে মুসলমান ঐক্যের ডাক দিয়েছে।

বিচারবিভাগ প্রশ্নটা তুলেছে কেন?

কারণ সারা বছর অসংখ্য মামলা সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গড়াচ্ছে, যেখানে মুসলমান নারীরা তালাকের পর খোরপোষ না পেয়ে তাদের এবং সন্তানদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এ কারণে নিজেদের এবং সন্তানদের জীবন ধারণের জন্যই তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং মুসলমান নারীদের এই প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে শুরু হয়েছে দেশে নতুন বিতর্ক।

এখন মুসলমান পুরুষরা তালাক দেওয়ার প্রথাকে আরো সহজ করে তুলেছে। আগে কোরানের পদ্ধতি মেনে স্বামী তার স্ত্রীকে সামনা-সামনি তালাক দিত। এখন ই-তালাক। পুরুষরা তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে মোবাইলে টেক্সট মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপ, ই-মেল ইত্যাদি

মাধ্যমগুলো ব্যাপক হারে ব্যবহার করে তালাক দিয়ে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরিয়তি তালাক আইন সম্পূর্ণ একপেশে ও পুরুষকেন্দ্রিক। এই আইনে স্ত্রীর তালাক প্রতিরোধ করবারও কোনো অধিকার নেই।

সারাদেশে সকলের জন্য অভিন্ন ফৌজদারি আইন থাকলেও ব্রিটিশ আমল ১৯৩৭ সাল হতেই বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকারের এবং হিল্লা বা হালাল প্রথার মতো বিষয়ে মুসলমানরা 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' দ্বারা পরিচালিত, আজও তা বিদ্যমান।

ভারতীয় মুসলমান মহিলারা মুসলমান ব্যক্তিগত আইনের নাগপাশ থেকে মুক্তি চায়। তারা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন যে তালাক আইনটি যেই তৈরি করুক না কেন, সেটি তাদের জীবনে যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেয়নি। তারা মনে করে যে এই আইনটি নারী বিরোধী এবং তাদের স্বার্থের পক্ষে খুবই হানিকর। ভারতীয় মুসলমান নারীরা প্রায় ১০০ শতাংশই এই প্রথার বিরোধী। তাদের মধ্যে বিরানব্বই শতাংশ নারীই বলেছেন, একতরফা ভাবে তিনবার মৌখিক অথবা ই-তালাক (মোবাইল, টেক্সট মেসেজ, হোয়াটস্ অ্যাপ, স্কাইপ, ই-মেল)-এর মাধ্যমে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের এই প্রথা বন্ধ হোক। বন্ধ হোক বহুবিবাহ প্রথা। বন্ধ হোক হল্লা বিবাহ প্রথা। এই প্রথাগুলো মুসলমান নারী সমাজের প্রতি অন্যায় অবিচার। তাদের দাবি, তালাকের আগে মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক করা হোক এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের ব্যাপক সংস্কার করা হোক। মৌখিক তালাকের নোটিশ পাঠানোর জন্য ঊননব্বই শতাংশ মুসলমান মহিলারা কাজি, উলেমা ও মৌলবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছে। তারা মনে করে ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে নারীর অধিকারকে আস্তাকুড়েতে ফেলে দেওয়া যায় না। তাই বিষয়টি তারা পেশ করবেন সরকার, আইন কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে। তারা সমাজের কাছে নিজেরাই নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে চায়।

তালাক আইনের একটি বিশেষ ধারা আছে। সেটা হলো স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় তার সেই স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায় এবং স্ত্রীও যদি বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত থাকে তবুও তারা সরাসরি বিয়ে করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তালাক আইনের বিধি হলো যদি স্বামী তালাক দেয় তবে সেটা বৈধ, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেটাই অবৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ না করে, তারপর স্ত্রীকে যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয় তবে পুনরায় দাম্পত্য মিলনে পাপ নেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বিয়ে কিন্তু কৃত্রিম বা নকল হলে চলবে না। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। এই প্রথাকে হিল্লা বা হালাল বিয়ে বলে। এই প্রথার মতো স্ত্রী জাতির প্রতি চরম অপমান ও অবমাননা বোধ হয় আর হয় না। নারীর পক্ষে এর থেকে মৃত্যুও বোধ হয় মন্দের ভালো। আসল কথা হলো, সামগ্রিক ভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনটিকে শুধু নারী বিরোধী ও নারী বিদ্বেষী আইন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, এটা একটি অমানবিক অসামাজিক, ঘৃণ্য নিষ্ঠুর আইন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে এই আইন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও ভারতে এটি এখনো প্রচলিত। এই প্রথার প্রচলন রয়েছে শুধু এই কারণে যে মুসলমান ধর্মীয় নেতারা চান না এই প্রথা পরিবর্তনের জন্য কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ। তাঁদের অভিমত হলো মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ভোগ করা তাদের ধর্মীয় অধিকার।

ভারতই এখন বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে এক বৈঠকেই তিনবার তালাক উচ্চারণ করে কোনো মুসলমান পুরুষ তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে। বহু মুসলমান দেশেই তিন তালাক প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সংশোধন ও সংযোজন করা দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মিশর।

মুসলমান প্রধান দেশ যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে বহু আগেই তিন তালাক এবং বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল ইসলামি পারিবারিক আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানেই মুসলমান জনসংখ্যায় ভারতের থেকে সামান্য এগিয়ে। অথচ বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ ভারত যেখানে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানে এখনো তিন তালাক, বহুবিবাহ, হল্লা বা হালাল প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র কি সম্ভব? এরকম প্রশ্ন নিয়ে আলাপ, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে যার মূলে রয়েছে এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে আরশিয়ার মতো বহু নারীর লড়াই।

এবার প্রশ্ন হলো, ভারতের মুসলমানরা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন? ভারতে এখনও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই রয়েছে। কিন্তু কেন?

মুসলমানদের অনেক সংগঠন যারা একে অন্যের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যেই বিরোধিতা প্রদর্শন করে থাকে। তারাই কিন্তু নারীদের উপর হওয়া তিন তালাকের মতো কষ্টকর প্রথার ব্যাপারে এক মত । তিন তালাক দেওয়া চাই-ই চাই। প্রাচীন প্রথার মূল্যায়ন হয় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আধুনিক যুগ ও সভ্য সমাজের পক্ষে এই প্রথাগুলো একেবারেই বেমানান, বেআইনি ও অনুপযুক্ত। বহু ইসলামিক দেশেই তিন তালাক প্রথা কার্যকরী হয় না। পাকিস্তানে তিন তালাক প্রথা নেই। তাহলে ভারতে সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যেই কি বহু বিবাহ, তিন তালাক জরুরি?

সৌভাগ্যের বিষয় সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে— তিন তালাক অসংবিধানিক। মুসলমান মহিলাদের অধিকার এতে খর্ব হয়। কোনো পার্সোনাল ল' বোর্ড সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। ■

সবুজ ট্যাক্সি

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কলকাতা এমন একটি শহর যেখানে এখনও কোনো কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিটারে যা ওঠে তার থেকে ২০-৩০ টাকা 'এক্সট্রা' চেয়ে বসেন। ধনঞ্জয় চক্রবর্তী কলকাতারই একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তিনিও 'এক্সট্রা' কিছু দাবি করেন। তবে টাকায় নয়। প্রত্যেক যাত্রীকে তিনি ছাতে-বারান্দায় গাছ লাগানোর অনুরোধ করেন। কেউ কথা দিলে তাঁর 'এক্সট্রা'টা উঠে আসে।

ধনঞ্জয়ের ট্যাক্সি সবদিক থেকেই সবুজ। পরিবেশ রক্ষার যুদ্ধে তাঁর হাতিয়ারও বটে। প্রথমেই চোখে পড়বে ট্যাক্সির ছাতে পাতা আসল ঘাসের বিছানাটি। ভেতরে, সামনের সিটের পিছনে একটি ট্রে-তে আটটি সবুজ ও সতেজ চারা। বাকি সাজসজ্জাতেও

সবুজের ছোঁয়া। দেখামাত্র যা পরিবেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রশংসা শুনে লাজুক হেসে ধনঞ্জয় বলেন, 'ছোটবেলা থেকে আমি গাছ ভালোবাসি। কোথাও গাছ লাগানো হচ্ছে খবর পেলে ছুটে যেতাম। আমি দেখেছি, গাছ লাগানো হয় কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গাছগুলো বাঁচে না। তাই ঠিক করেছি, গাছ লাগানো এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখা জরুরি আমার মতো করে আমি সবাইকে বলব।'

ধনঞ্জয়ের ডাকনাম বাপি। পাড়ায় সবাই ডাকে 'গেছোবাপি' বলে। গাছ ভালোবাসেন তো, তাই। সেই ভালোবাসা কতটা গভীর একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ট্যাক্সির ছাতের 'তৃণভূমি'টুকু বাঁচিয়ে রাখতেই মাসে তার ২২.০০০ টাকার মতো খরচ হয়। ধনঞ্জয় বলেন, 'ঘাসের বেড যে ট্রে-র ওপর রাখা আছে তার ওজন ৬৫ কেজি। কিন্তু আমি এমনভাবে রেখেছি ট্যাক্সির ছাতের কোনো ক্ষতি হবে না। ছাতে ঘাস রাখার একটা সুবিধে কী, ভেতরটা ঠাণ্ডা থাকে। আমার ট্যাক্সি কলকাতার যে কোনো নন-এসি ট্যাক্সির থেকে বেশি ঠাণ্ডা, এটা ভাবতেই আমার দারুণ লাগে।'

ট্যাক্সির ছাতে বাগান করার আইডিয়া ধনঞ্জয় পেয়েছিলেন একটা ওয়েবসাইট থেকে। 'ঘাসের বিছানার নীচটা মেটালের তৈরি। তার ওপর মাটি আর সামান্য সাদা বালির সংমিশ্রণে ধনঞ্জয় জমি তৈরি করেছেন। ট্রে-তে অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে। অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার নিকাশি ব্যবস্থা। যেভাবে লোকে বাড়ির বাগান দেখায় ধনঞ্জয় ঠিক সেভাবেই তাঁর ট্যাক্সি দেখান। চোখভরা খুশি নিয়ে বলেন, 'তিন বছর আগে একদিন রাতে পিছনের সিটে আমি সুন্দর শেপের মদের বোতল পেয়েছিলাম। ওই বোতলে প্রথম আমি একটা সানি প্ল্যান্ট রাখতে শুরু করি। বোতলটা থাকত সামনের সিটের পিছনের ট্রে-তে। কিছুদিন পর দেখলাম গাছটা বেশ বড়ো হয়ে গেছে। এত বড়ো যে সামনের জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। খুব আনন্দ হলো। ভাবলাম এবার থেকে সবাইকে গাছ লাগানোর কথা বলব।'

ট্যাক্সি ধনঞ্জয়ের নিজের নয়। যিনি মালিক সেই অমরীশ সিং বলেন, 'ধনঞ্জয় খুব ভালো ড্রাইভার। গাড়ি রাখেও খুব যত্নে। যেদিন ওকে প্রথম আমার গাড়ি চালানোর কথা বলি সেদিনই ও আমায় গাড়ি গাছ দিয়ে সাজানোর কথা বলেছিল। আমি আপত্তি করিনি। এমন একটা কাজে ওর পাশে থাকতে আমার ভালোই লাগে।'

ধনঞ্জয়ের সহকর্মী অন্য ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা আগে হাসিঠাট্টা করতেন। কিন্তু এখন তাঁর সবুজের অভিযানে সবাই শামিল। টালিগঞ্জ- করুণাময়ীর ট্যাক্সিস্ট্যান্ডটি তার প্রমাণ। নানারকম চারাগাছ দিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডটি সাজানো। কেউ না কেউ জল দিচ্ছেন, পরিচর্যা করছেন। এটাই বরাবর চেয়েছেন ধনঞ্জয়। সবাই এগিয়ে আসুক। নয়তো পরিবেশ বাঁচবে না। সবুজ পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়বে। একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের সোনার পৃথিবী। তা থেকে বাঁচার একটু প্রচেষ্টা। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

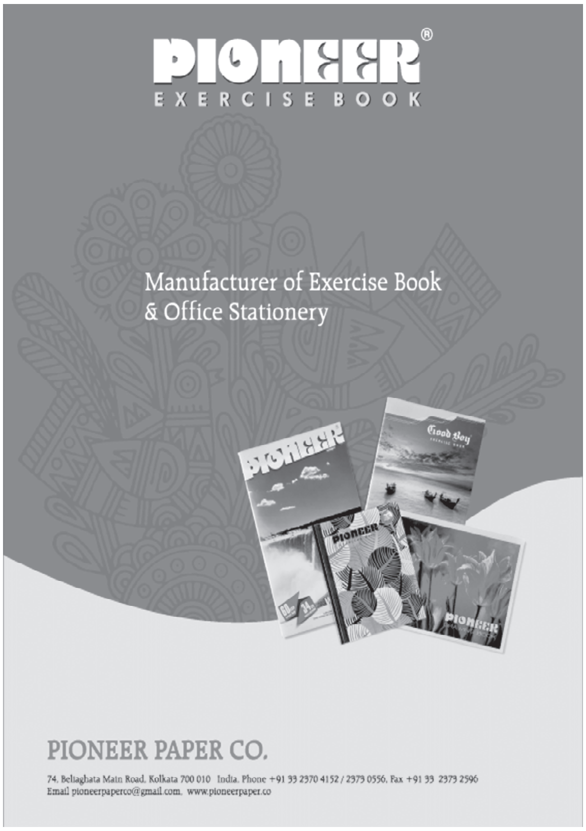

"জাতীয় উন্নতির পরিবর্তনের সূচনারূপে উনবিংশ শতাব্দী যে ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করেছে, তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁর নাম সকল সম্ভাব্য আদর্শ এবং চিন্তাধারার সমন্বয়স্বরূপ। এই মহাজীবনে হিন্দুধর্ম শঙ্করাচার্যের দর্শনকে রক্তমাংসের মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখেছে এবং অবশেষে এই চেতনা লাভ করেছে যে, যে কোন ধর্ম, যে কোন মতবাদ মানবের প্রকৃত লক্ষ্য, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে সর্বপ্রকারে সক্ষম (যত মত, তত পথ)।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

প্রেরণা শিবিরে আসা সেবিকারা।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি : পরিবর্তনের দিশারি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কুসুম লোধারির জন্ম খারওয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটি ধীবর পরিবারে। গুজরাটের সমুদ্রশহর পোরবন্দরে পরিবারটির অনেকদিনের বসবাস। অন্তত দশ বছর আগে কুসুম বুঝতে পেরেছিলেন, খারওয়া সম্প্রদায়ের মেয়েরা যে পরিবেশে জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে তো পড়েই, সেই সঙ্গে জীবনসংশয়ও দেখা দেয়। সাধারণত এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের ১৬ বছরে পা দেবার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। সমাজ এ ব্যাপারে বেজায় কড়া। মেয়েদের বয়েস ১৭ পেরিয়ে গেলে চলবে না। যদিও ছেলেদের বয়েস ৩০ পেরিয়ে গেলেও কোনো আপত্তি নেই। বয়েসের এই ব্যবধানের জন্য স্বামীর মৃত্যু হয় স্ত্রীর অনেক আগে। মেয়েরা অল্পবয়েসেই বিধবা হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

খারওয়া সমাজের রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েরা সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যেহেতু তারা লেখাপড়া জানে না, আর্থিক সংস্থানও নেই, তাই তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কুসুম লক্ষ্য করেছিলেন মাছ ধরার কারণে দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে থাকার ফলে তাঁদের সম্প্রদায়ের পুরুষেরা অনেকেই শরীরে এইডস রোগ নিয়ে ফিরে আসেন। এদিকে সমাজের অভ্যন্তরেও অসংখ্য অল্পবয়েসি বিধবা। সেই সময় খারওয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এইডস প্রায় মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। কুসুম এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ৩০০ মহিলাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব বাহিনী। বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছিলেন তারা যেন আর গয়না শাড়িতে সময় নষ্ট না করে। প্রথমেই তাঁরা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে অসুস্থ মহিলাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এটা ছিল সাময়িক সমাধান। প্রকৃত সমাধান মিলল কিছুদিন পর। যখন দিনের পর দিন প্রত্যেকটি পরিবারের কাউন্সেলিং করে এবং সমাজের মাথাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্থির হলো এইচ আই ভি রিপোর্ট নেগেটিভ না হলে কারও বিয়ে হবে না। রিপোর্ট দেখাতে হবে দু'বার। বিয়ের কথাবার্তা শুরু হবার সময় এবং এনগেজমেন্টের সময়। কিন্তু তার ছ' মাসের মধ্যে যদি বিয়ে না হয় তাহলে আরও একবার দেখাতে হবে। আট বছর আগে নেওয়া এই সিদ্ধান্তের জোরেই খারওয়া সম্প্রদায় অকাল-অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে গেছে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য এবং যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, দৈবাৎ স্বামীর মৃত্যু হলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করার জন্য কুসুম মেয়েদের সঞ্চয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে বা পোস্ট-অফিসে কীভাবে টাকা রাখতে হয়।

১৯৯৬ সাল থেকে কুসুম রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির একজন সেবিকা। সমাজের মোড় ঘুরিয়ে দেবার সাহস এবং প্রেরণা তিনি সমিতির কাছ থেকেই পেয়েছেন। কোনো নিউজ চ্যানেল তাঁদের দেখায় না, কোনো সংবাদপত্র তাঁদের কথা লেখে না কিন্তু কুসুম লোধারির মতো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির হাজার হাজার সেবিকা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবর্তনের দিশারি হয়ে কাজ করে চলেছেন। এরকম অনেক অনাম্নী সেবিকা দিল্লীতে আয়োজিত অখিল ভারতীয় কার্যকর্ত্রী প্রেরণা শিবিরে সমবেত হয়েছিলেন। কীভাবে সংগঠনকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়, কীভাবে মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়া যায় প্রেরণার শক্তি তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা, মত-বিনিময় করলেন সেবিকারা।

পুষ্প চাকমা এসেছিলেন মিজোরাম থেকে। যদিও পড়াশোনা করেছেন সমিতির নাগপুর কেন্দ্রের দেবী অহল্যামন্দির হোস্টেলে থেকে। পড়াশোনা শেষ করে তিনি তাঁর

জন্মস্থান মিজোরামের লাওয়াংলাই জেলার কমলানগর গ্রামে অহল্যামন্দিরের ধাঁচেই একটি হোস্টেল তৈরি করেন। গ্রামের মেয়েদের জন্য কিছু করা দরকার, এই বোধ তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। হোস্টেলে এখন ১৪ জন মেয়ে থাকে। আগে তারা দূরবর্তী গ্রাম থেকে ২-৩ দিন ধরে হেঁটে কমলানগরে এসে পৌঁছত। কমলানগরে মূলত চাকমাদেরই বসবাস। এখানে যেসব স্কুল আছে কোনোটিতেই চতুর্থ শ্রেণীর বেশি পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। কেউ যদি আরও পড়তে চায় তাহলে তাকে কোনো হোস্টেলে অথবা কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে হবে। দুটোর কোনোটাই সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সমিতির প্রেরণা পুষ্প চাকমাকে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে দিয়েছিল। কথাটা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমি সমিতির জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাই মনে হয়েছিল আমার গ্রামের মেয়েদের জন্যেও এরকম কিছু একটা করা দরকার। যাতে ওরাও আমার মতো পড়াশোনা করতে পারে।'

পুষ্প একা নন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তত ২০০ জন ছাত্রী সমিতির বিভিন্ন হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। এই মেয়েদের সাহসিকতার কথা শুনলে রোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যখন অসমের ১৭টা গ্রাম দুষ্কৃতী-তাণ্ডবে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, স্থানীয় মিডিয়া ঘটনাটাকে জনজাতি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সংঘাত বলে চাউর করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে এবং প্রমাণ করে ছাড়ে ঘটনাটা বাইরে থেকে আসা দুষ্কৃতীদের দাঙ্গা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অভিঘাত এত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে কেন্দ্রের তৎকালীন ইউপিএ সরকার তাদের পুরনো সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতে বাধ্য হয়।

এই সেদিনও লাদাখের লামা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুসন্ন্যাস প্রথার চল ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং কিশোরদের সন্ন্যাসী বানিয়ে দেওয়া হোত। এর ফলে শিশু লৈঙ্গিক সূচকের (প্রতি হাজারে নারী ও পুরুষশিশুর সংখ্যা) ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছিল। সমাজে কমে যাচ্ছিল বালক ও কিশোরের সংখ্যা। এক সময় কিছু অসাধু লোক এর সুযোগ নিতে শুরু করল। এদের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টরাও ছিল। তারা লামা মেয়েদের কিনে নানাভাবে তাদের শোষণ করত। ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি প্রথম এই ঘটনার কথা জানতে পারে। কিছু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার ছিল। লামা সম্প্রদায়ের প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, আগে ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। তারপর প্রবীণরা যদি মনে করেন তাহলে তাদের সন্ন্যাসী হবার জন্য মঠে পাঠাতে পারেন। পদক্ষেপটি যে সঠিক তার প্রমাণ মিলল কিছুদিন পর, যে সম্প্রদায় প্রায় পুরুষশূন্য হতে বসেছিল, দেখা গেল একটি দুটি করে পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে। শিশু লৈঙ্গিকসূচকও আর ততটা ভয়াবহ দেখাচ্ছে না।

লামা সম্প্রদায়ের মেয়েদের সমস্যাটা অন্যরকম। তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন জলন্ধরের মেয়েদের হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক সুশ্রী শ্রেষ্ঠা, 'যেহেতু লামা মেয়েদের গায়ের রং ফর্সা তাই বিদেশিদের ধারণা ওরা যে সন্তান প্রসব করবে তাদের দেখতে সুন্দর হবে। আমরা লামা মেয়েদের এই হোস্টেলে রেখে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিই। আমাদের চেষ্টার ফল ফলতে শুরু করেছে। যদিও এখনও অনেক কিছু করা বাকি। এই

মুহূর্তে লামা সম্প্রদায়ের ২৬ জন মেয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।'

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতিকে সাধারণভাবে একটি নারীবাদী সংগঠন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আদৌ তা নয়। ইউরোপীয় ধাঁচে তৈরি ভারতীয় নারীবাদ কখনও দেশের মেয়েদের অন্তরের মানচিত্রটি তুলে ধরেনি, ধরবেও না। বস্তুত ভারতের মেয়েদের 'ভারতীয়' করে রাখাতেই তাদের ঘোরতর আপত্তি। ভারতের সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধের জ্ঞান এখনও তাত্ত্বিক নারীবাদীদের হয়নি। সেই আত্মীয়তা মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন আর একজন সেবিকা। তাঁর নাম শ্রীমতী নির্মলা শিরখেড়কর।

নির্মলা শিরখেড়কর নাগপুরে থাকেন। ২০০১ সালে অসমের হাফলঙে হোস্টেলে থাকার সময় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। তিনি বলেন, 'সমিতির সেবিকাদের কাছাকাছি থাকার সময় আমি এমন এক আত্মীয়তার স্পর্শ পেয়েছিলাম যা আমাকে পরে পাকাপাকিভাবে সমিতিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে। যখন হাফলঙে পৌঁছই ট্রেন আমাদের ৩ কিলোমিটার দূরে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হোস্টেলে নিয়ে যাবেন বলে সমিতির চারজন সর্বক্ষণের সেবিকা (প্রচারিকা) পাহাড়পর্বত পেরিয়ে স্টেশনে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অসমে যাওয়ার সময় ভেবেছিলাম এই শেষবার, আর কখনও সেখানে যাব না। কিন্তু ওই ঘটনাটি আমার মনকে এতটাই ছুঁয়ে গিয়েছিল যে আমি তার পরের ১৫ বছরে ২২ বার অসমে গেছি।'

২০০৫ সালে সমিতির উদ্যোগে নাগপুরে অখিল ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেবারের সম্মেলনে প্রধান কার্যক্রম ছিল বন্দনীয়া মওসিজীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। কিন্তু আরও একটা কারণে শ্রীমতী শিরখেড়করের কাছে এই সম্মেলন আজও গুরুত্বপূর্ণ। সেবারই তিনি তৎকালীন প্রমুখ সঞ্চালিকা ঊষাতাই চাটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মওসিজী কেলকারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ গ্রামোন্নয়নের কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে তিনি তাঁর পিতৃপিতামহের গ্রাম নাগপুর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে আজানির উদ্দেশে রওনা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি আর গ্রামে যাননি। সমিতির কাজ করবেন বলে গেলেন। তিনি গেলেন, আশপাশের বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরে কয়েকটি মেয়েকে জোগাড় করলেন। তারপর একটি গাছের নীচে শুরু হলো তাঁর এমব্রয়ডারি শেখানোর স্কুল। ধীরে ধীরে সেখানে সমিতির শাখা গড়ে উঠল। প্রথম প্রজন্মের যেসব মেয়েরা এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁদের মেয়েরা এখন সমিতির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত। এক সময় যেসব মেয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে দ্বিধা বোধ করতেন এখন তাঁরাই সমিতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ নির্মলাদেবী এখানেই থেমে থাকতে চাননি। সম্প্রতি তিনি গ্রামের অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের জৈব প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদের প্রশিক্ষণ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজের প্রথম ধাপে তিনি চারটি দেশি গাভী বাড়িতে পালন করেন। গ্রামের বাসিন্দাদেরও নিরলসভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন যাতে তাঁরাও যে-যার বাড়িতে অন্তত একটি করে দেশি গাভী পালন করেন। যা চেয়েছেন তা করতে পারার তৃপ্তি ফুটে ওঠে তাঁর চোখেমুখে। সহাস্যে বলেন, 'মেয়েরাই এখন এ গ্রামের পরিবর্তনের দিশারি, এটা ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে।'

আরও একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন

করেছেন নির্মলাদেবী। তাঁর গ্রাম আজানি এখন সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েরা যেসব ব্লাউজ পিস উপহার পান সেগুলো দিয়ে ব্যাগ তৈরি করে তিনি ও সমিতির অন্য মেয়েরা দোকানে-দোকানে যান এবং প্রত্যেক কাস্টমারের হাতে একটি করে ব্যাগ তুলে দেন। অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে আর প্লাস্টিক ব্যবহার না করেন। নির্মলাদেবী বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ৩০০০ ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। মেয়েদের পুরনো শাড়ি বা দোপাট্টা থেকেও ব্যাগ তৈরি করা হয়। এই কার্যক্রমের অভিঘাত এতটাই যে এখন অনেক মেয়েই তাদের অব্যবহৃত ব্লাউজপিস ব্যাগ তৈরি করার জন্য আমাদের দিয়ে দেয়। আসলে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্লাউজপিস এবং নারকেল উপহার দেবার রেওয়াজ আছে। যেহেতু সব ব্লাউজপিস থেকে ব্লাউজ বানানো হয় না, পড়েই থাকে আলমারির কোণে, সেগুলো থেকেই ব্যাগ তৈরি করা হয়। এখন অবস্থা এমন হয়ে গেছে, অনেকে ব্লাউজপিস উপহার না দিয়ে সরাসরি ব্যাগ উপহার দেন।'

শ্রীমতী অর্চনা হরসে সমিতির একজন প্রান্ত কার্যবাহিকা। আপাতত তাঁর নিবাস আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সমিতি এখানে কাজ শুরু করেছে পাঁচ বছর আগে। বর্তমানে সমিতির শাখা রয়েছে দক্ষিণী ও দক্ষিণী মধ্য আন্দামানে। অর্চনাদেবী বলেন, 'যেহেতু মূল্যবোধের অবক্ষয় এখানকার প্রধান সমস্যা তাই আমাদের কাজের লক্ষ্য হলো সংস্কার। আমরা মোট পাঁচটি সংস্কার কেন্দ্র চালাই। পোর্টব্লেয়ারে ২টো এবং রঙ্গাচং, বমবুফ্ল্যাট ও রঙ্গত বে-তে ১টি করে। এছাড়া রয়েছে ৮টি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরিচালিত শাখা।'

সারাদেশেই সমিতির সেবামূলক কাজের পরিধি বাড়ছে। সমিতির অখিল ভারতীয় সেবাপ্রমুখ সুশ্রী সন্ধ্যা টিপরে বলেন, 'লবণ উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত গুজরাটের আগারিয়া সম্প্রদায়ের শিশুদের লেখাপড়া শেখার চল ছিল খুবই কম। ওখানকার মেয়েরাও ছিল নিরক্ষর। ১৭ বছর আগে আমরা ওখানে কাজ শুরু করেছিলাম। তার ফল আমরা পেলাম ভুজে (গুজরাটে) ভূমিকম্পের সময়। রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা যখন ওখানে গেলাম স্থানীয় মানুষেরা আমাদের যারা সর্বস্ব হারিয়েছে তাদের আগে সাহায্য করার কথা বললেন। মানুষ যখন বিপর্যস্ত তখনও যদি কেউ অন্য আর একজনের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা দেখান তাহলে বুঝতে হবে পরিবর্তন এসে গেছে। আমরা পেরেছি। ভূমিকম্পের পর সুন্দরনগর জেলায় মায়াপুর বলে একটা গ্রাম আমরা অধিগ্রহণ করেছিলাম। গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনই ছিল উদ্দেশ্য। গ্রামে যে স্কুল ছিল সেখানে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়া যেত। আরও পড়াশোনা করতে চাইলে যেতে হোত অন্য গ্রামে। ছেলেরা কোনোভাবে ম্যানেজ করলেও মেয়েদের পড়াশোনায় ইতি টেনে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকত না। মায়াপুরকে 'নির্মলগ্রাম' করে তোলার জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি। সেই টাকায় আমরা একটা গাড়ি কিনেছি। তাতে গ্রামের মেয়েদের অন্য গ্রামের স্কুলে পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা হলো। যে মেয়েটি প্রথম বাইরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল সে এখন এমবিবিএস পড়ছে। এক বছরের মধ্যেই পুরোদস্তুর ডাক্তার হয়ে যাবে।'

সমিতির আরও অনেক কার্যক্রম রয়েছে যা প্রায় নিঃশব্দে বিপ্লব আনার কাজ করে চলেছে। যোগাসন কেন্দ্র বা আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করার পাশাপাশি সমিতির সেবিকারা পুষ্যানক্ষত্র তিথিতে ১২ বছরের কমবয়সি শিশুদের সুবর্ণপরাসন খাওয়ানোর কাজ করছেন। স্বর্ণচূর্ণ, মধু ও অন্য কিছু ভেষজ দিয়ে নির্মিত এই সুবর্ণপরাসন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে খুবই উপযোগী। ১২ বছরের কমবয়সি শিশুদের সুবর্ণপরাসন দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। গুজরাটের পর সম্প্রতি নাগপুরেও এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিশু যাতে ইতিবাচক সংস্কার নিয়ে জন্মায় তার জন্য অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের কী খেতে হবে, কী ধরনের বইপত্র পড়তে হবে কিংবা চিন্তাভাবনার ধরন কেমন হবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সড়োগড়ো করে তোলার জন্য বিশেষ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। অর্চনাদেবী জানালেন, 'যেহেতু ডিজিটাল প্রযুক্তি আধুনিক জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই মেয়েরা পঞ্জাবে গুজরাটে মহারাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য সানন্দে এগিয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও আলপনা দেওয়া, সেলাই এবং এমব্রয়ডারিও শেখানো হয়। মেয়েদের প্রতিভা যাতে ঠিকমতো বিকশিত হয় এবং তারা যাতে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে তার জন্য সবধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সম্প্রতি দিল্লীতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রেরণা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ১১ নভেম্বর শিবিরের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, মাতৃশক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ভারত তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

সমাজ এবং জাতির সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিরলস প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন জৈনমুনি জয়ন্তজী মহারাজ। তিনি বলেন, সামাজিক কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ ভারতীয় দর্শনের বুনিয়াদ। সব কিছুর আগে জাতীয় স্বার্থকে রাখা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রমুখ কার্যবাহিকা অন্নদানম সীতা সমিতির ৮০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাপথটি উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন।

শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যারা-অলিম্পিকে সিলভার পদকজয়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদ দীপা মালিক। তিনি বলেন, 'শিবিরার্থীদের অনুপ্রেরণা দেবার জন্য আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমি নিজেই শিবিরে এসে অনুপ্রাণিত বোধ করছি।' এনএএল, বেঙ্গালুরুর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. ভি. শুভা বলেন, বাবা-মা এবং গুরুজনদের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা ভি. শান্তাক্কা বলেন সমিতি একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, সেখান থেকে যুবসমাজের কাছে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এবং তাদের চিন্তা ও কর্মের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে, তার দিশা দেখানো যায়। তিনি আরও বলেন, 'যুবসমাজকে ইতিবাচক এবং উদ্দেশ্যমুখী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যাতে তারা দেশময় ছড়িয়ে পড়া সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।' এর আগে ড. উমা বৈদ্য, ড. মীনা চন্দ্রভারকর এবং ড. জ্যোতিকিরণ শুক্লা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। গোয়ার রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহা এবং লোকসভার অধ্যক্ষা সুমিতা মহাজনও ভাষণ দেন। ■

তাঁতিবেড়িয়ায় অর্শ নিরাময় শিবির

হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে ৪ ডিসেম্বর 'অর্শ নিরাময় শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিশিষ্ট অর্শচিকিৎসক ডাঃ বি সি সাহা ৬৩ জন গোষ্ঠীর চিকিৎসা করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সমিতির বাৎসরিক এই সেবা উদ্যোগটি এবারে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল।

শ্রদ্ধানিধি

গত ৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার প্রাক্তন জেলা কার্যবাহ শমিত দাশের পিতৃ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মোট পাঁচটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধানিধি সমর্পণ করেন শমিত দাশ ও তাঁর পরিবার। সঙ্ঘের সেবাকাজের জন্য শ্রদ্ধানিধি তুলে দেওয়া হয় পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পালের হাতে। স্থানীয় তিনটি মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের জন্য শ্রদ্ধানিধি তুলে দেওয়া হয় মন্দির কমিটির সদস্যদের হাতে এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য শ্রদ্ধানিধি তুলে দেওয়া হয় ভারতীয় জনতা পার্টির মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্রের প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, মেদিনীপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভূঁইয়া, মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

ভ্রম সংশোধন

গত ৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় শোক সংবাদে ভুলবশত কৌশিক ঘোষের পিতা অসিত ঘোষ ছাপা হয়েছে। হবে—কৌশিক ঘোষের পিতা জয়চাঁদ ঘোষ।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার খিচকা শাখার স্বয়ংসেবক পিন্টু কোটালের পিতৃদেব সুধীর কোটাল গত ২৮ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

গত ৯ নভেম্বর কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মালদার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দীনেন দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছাড়াও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। তিনি শুধুমাত্র সঙ্গীতশিল্পী ও সংগঠকই ছিলেন না, বহু বছর ধরে পুস্তক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে মালদহের পুস্তক ব্যবসার জগতে খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। 'সংস্কার ভারতী'তে তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন। সম্পাদক, সহ-সভাপতি কার্যকরি সভাপতি সবশেষে উপদেষ্টা পদে আসীন ছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

পরলোকে মায়া বসু

গত ৬ ডিসেম্বর মায়া বসু পরলোকগমন করেছেন। কলকাতায় সল্টলেকে আমরি হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই ওই দিন মাঝ রাতে (১২-৪৫ মি.) তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। তাঁর ও স্বর্গীয় অশোক বসুর একমাত্র পুত্র বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত কার্যবাহ।

দেশ ভাগের কারণে ছোটবেলাতেই তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। বিবাহের পর বারুইপুরে নিজ বাসভবনে আমৃত্যু ছিলেন। অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও হাসিমুখে সারাজীবন নিজের কর্তব্য পালন করে গেছেন। স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃসমা। সকলকেই সমাজের কাজের জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছেন। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়া ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজের একটি যা তাঁর সমাজসচেতনতার পরিচয় বহন করে। স্থানীয় এলাকায় মন্দির স্থাপনে বাধা সৃষ্টি হলে তিনিও ছিলেন অন্যতম প্রতিবাদী। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘপরিবার শোকাহত। সঙ্ঘের অন্যতম সহসরকার্যবাহ ভি ভাগাইয়াজী বারুইপুরে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানান।

শব্দরূপ-৮১৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	■
■	■	৮	৯	■		■	■
১০	■	■	১১			■	১২
	■	■		■		■	
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কশ্যপপত্নী; গরুড়ের মাতা, **৩.** পুরাণোক্ত অভীষ্টদায়িকা গাভী, **৫.** ‘‘ওরে —, ওরে আমার কাঁচা/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা’, **৬.** কবর, **৮.** বিষ্ণুর প্রথম অবতার, **১১.** জমিদারের প্রজা, **১৩.** মৃত্যুকালে যে ঘাম হয়, **১৪.** অশ্বারোহী সৈন্যদল।

উপর-নীচ : ১. ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র), **২.** ভাদ্রমাসের শুক্লানবমী যে তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তালফল-দানঘটিত ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, **৩.** জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী, **৪.** পুরীর সমুদ্রে যারা মাছ ধরে এবং সমুদ্র স্নানার্থীদের স্নানে সাহায্য করে, **৭.** কৈলাস পর্বত, **৯.** দুরাত্মা, পাপী, **১০.** অপ্সরা বিশেষ, শকুন্তলার মাতা, **১২.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১১

বী	র	বা	হু	■	ন	■	ক
■	■	মা	■	■	বি	শ্ব	পা
ও	■	চা	ন্দ্র	মা	স	■	ল
কা	ন্তা	র	■	দ্রী	■	■	কু
ল	■	■	সী	■	কো	দ	ণ্ড
ত	■	শ	তা	নী	ক	■	লা
না	পি	ত	■	■	ন	■	■
মা	■	দ্রু	■	ম	দ	য়	ন্তী

সঠিক উত্তরদাতা
সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

৮১৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

একথা সত্য যে মানসিক দাসত্বের কারণে আমাদের নিজস্ব চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বাহ্যিক জীবনে চলমান বিদেশি প্রভাব অভ্যন্তরীণ স্বাবলম্বীদের ভাবনা কম করে এবং ধীরে ধীরে এরূপ সময় আসে যখন সম্পূর্ণ জাতীয় জীবন নষ্ট হওয়ার মতো সঙ্কট দেখা দেয়। বিশ্বে অনেক বড় বড় জাতি এইভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরাও যদি সম্পূর্ণ জীবনপ্রবাহে বাইরের পদ্ধতিকে অন্ধ নকল করতে থাকি তাহলে আমরা উন্নতি করতে পারবো না। এই প্রকার অনুকরণ হলে বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তাই সম্পূর্ণ জীবনের মূলে স্বাভিমান থাকা প্রয়োজন এবং এইভাবে সারা বিশ্বের মধ্যে সঠিক বার্তা আদান প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য কর্মপদ্ধতির দিশা দেখানো যেতে পারে।

* * *

আমাদেরও আর্থিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। যদি আমাদের কার্যক্রমের সফলতা বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাহলে অবশ্যই আমাদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বন্ধনকারক হবে। যে সমস্ত দেশ আর্থিক সাহায্য করে আমরা তাদের প্রভাবের মধ্যে পড়ে যাব। আমাদের আর্থিক যোজনাগুলি পূরণ করার জন্য সম্ভাব্য বাধা দূর করার লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে মৌন থাকতে হবে। যে দেশ অন্যের উপর নির্ভরশীল তাদের স্বাভিমান নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার স্বাভিমানশূন্য রাষ্ট্র কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মতো ছাপ রাখতে পারে না। এটাও নিশ্চিত যে বাইরের কোনো দেশ আমাদের খুশিমতো ব্যবহার যোগ্য আর্থিক সাহায্য করবে না। আমাদের পরিকল্পনাকে তারা কাটছাঁট করবে এবং আমাদের এমন পরিকল্পনা বানাতে বাধ্য করবে— যা আমাদের পক্ষে অনুকূল না হলেও বিদেশি সাহায্যের সঙ্গে মিল খাবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৬

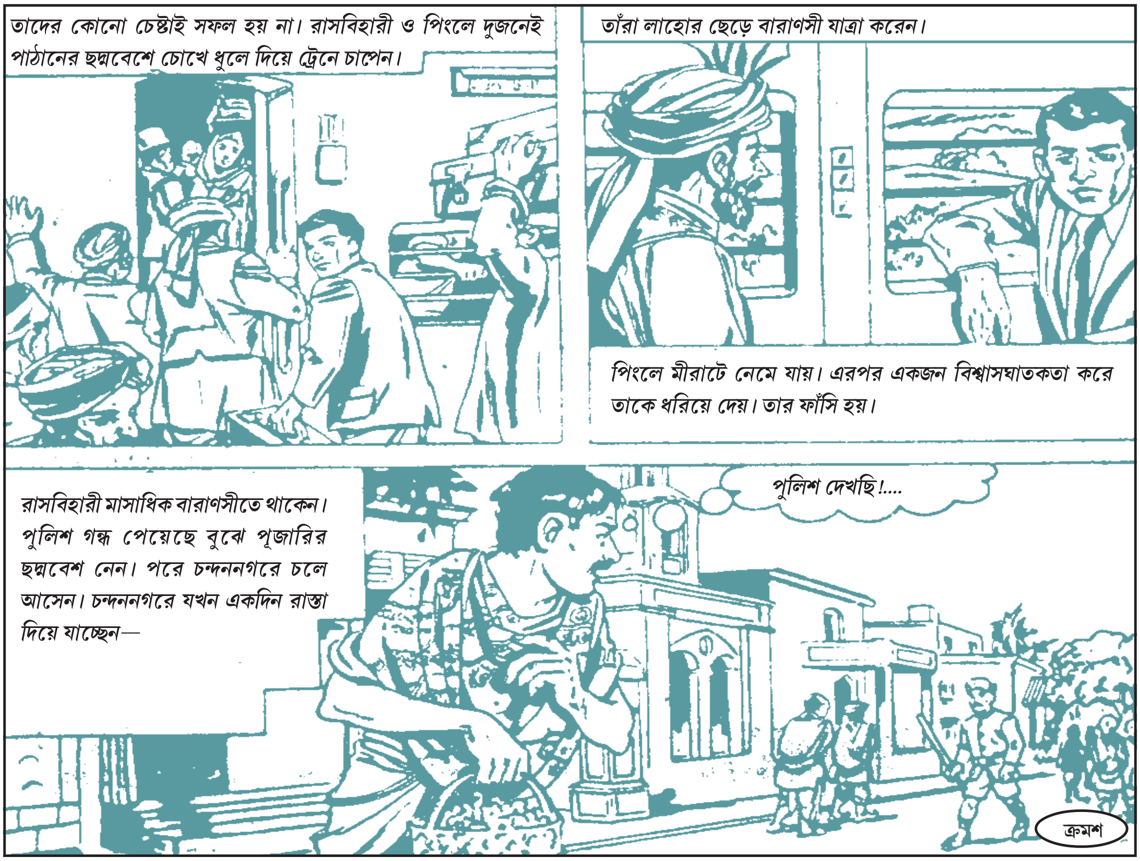

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
TURMERIC POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA TURMERIC POWDER
DUTA CUMIN POWDER
DUTA Curry Powder
DUTA RED CHILLI POWDER
DUTA CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No. 12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
19 December - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।